রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়

উৎসর্গ

ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস

সুহৃদবরেষু

এই লেখকের অন্য বই

সুখী রাজপুত্র

রাজা যায় বনবাসে

অলৌলিক জলযান

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

—আর কতদূর বাবা ?

—ঐ তো দেখছ, দূরে গরিপরদির মঠ। ছাখো মঠের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

—কৈ বাবা ?

—দেখছ না, ছাখো আকাশের নীচে ঠিক দক্ষিণ পশ্চিমে তাকাও, দেখতে পাচ্ছ ?

অনল বাবার পাশে পাশে হাঁটছে। সে নানাভাবে চেষ্টা করেও দেখতে পাচ্ছে না। বাবা হয়তো তাকে আড়াল করে রেখেছে। সে লাফিয়ে ছ'পা সামনে এগিয়ে গেল। দেখল, মাথা তুলে দেখল, মাঠের শেষে, অনেক দূরে গাছগাছালির ভেতর থেকে ইস্পাতের চক্র জ্বলজ্বল করছে। প্রায় আকাশে ঝুলে থাকার মতো, এবং বাবা আর কি বলবে সে জানে। তারপর নীল, ছোট্ট খাড়ি নদী, বাঁশের সাঁকো পার হয়ে যাব। বড় একটা দরগা দেখতে পাবে কিছু দূরে গেলে। সোজা সড়কে উঠে গেলে বেশি দূর আর হাঁটতে হবে না। অলিপুরা পার হয়ে গেলে মাইলখানেকের মতো পথ। সূর্য্য মাথার ওপর উঠে যাবে তখন। রোদে হাঁটতে পারবে না। কষ্ট হবে। পা চালিয়ে হাঁটো।

অনল এতক্ষণ খুব পা চালিয়ে হেঁটেছে। সকাল থেকে ভেবেছে বাবার মনে কোনো কষ্ট দেবে না। বাবা যা বলবে তাই সে করবে। রাতে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। মা হয়তো ভেবেছিল, অনল ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবাকে মা কত সব দুঃখের কথা বলেছে। কখনও কখনও রাগে অভিমানে খারাপ কথা পর্যন্ত বলে ফেলেছে। তখন বাবার জন্য অনলের কষ্টটা আরও বেড়ে যায়। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে পায়, তুমি বে-আককেল মানুষ, সারা-জীবন আমাকে জ্বালিয়ে

মেরেছ। কত বয়স ছেলেটার, তাকে রেখে আসছ পরের বাড়িতে। বাবা বুঝিয়েছে, পরের বাড়ি কোথায় দেখছ—অনল তো মামার বাড়িতে পড়তে যাচ্ছে। তোমার বাবা নেই, তাতে কি হয়েছে, তোমার ছোটকাকা তো বেঁচে আছেন।

সাগর বলল, তুমি ভাল হয়ে থেক নীল।

—আমি খুব ভাল হয়ে থাকব।

—মেজ-মামীর কথা শুনবে।

অনল মেজ-মামীকে দেখেনি। একটা রূপকথার মতো মেজ-মামী এবং তার মেয়ে পদ্ম। ওরা কলকাতার লোক। কলকাতায় থাকলে মানুষেরা রূপকথার মানুষ হয়ে যায় অনল টের পেত। কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে মেজমামীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মেজমামা। বড়দা, পদ্ম সবাই কলকাতা থেকে বছরখানেক আগে চলে এসেছে। এবং মার কাছে বাবা পদ্মর খুব প্রশংসা করেছে। কলকাতায় থাকলে সবাই বুঝি খুব ভালো হয়, সুন্দর হয়। একবার মা অনলকে নিয়ে যাবে বলেছিল, তারপর কি যে কেমন গুম মেরে থেকেছিল কিছুদিন, আর যায় নি।

অনল বলল, বাবা তুমি আমাকে আবার কবে নিয়ে আসবে.

—গ্রীষ্মের ছুটিতে নিয়ে আসব। বড় গাছে তখন আম পাকবে। পুকুরে বেশি জল থাকবে না। কম জলে আমি তোমার জন্য মাছ ধরতে পারব।

আরও কত সব কথা, বারবার অনল বলতে চেয়েছে। সে আসার সময় মাকে কথা দিয়েছে, কোনো দুষ্টুমী করবে না। ভাল করে লেখাপড়া করবে। মেজমামীর কথা শুনবে।

অনলের হাতে ছোট্ট টিনের সুটকেস। পাশিংশোর বাক্সটা তার একমাত্র সম্পত্তি। বাবা নারানগঞ্জ শহর থেকে কিনে এনেছিল। ওতে অনলের বই খাতা পেন্সিল। বাবার হাতে বড় একটা পুঁটলি। ওতে ওর জামা-প্যান্ট। শীতের রং-ওঠা চাদর

বাবা বারবার টিনের বাক্সটা ওর হাত থেকে নিতে চেয়েছে—বারবার অনল বলেছে, আমি পারব বাবা।

ওরা এ-ভাবে কখনও পার হয়ে যায় মাঠের পর মাঠ। এবং বসন্তকাল বলে, মাঠে যব গমের খেত, সোনালি যবগাছ ওর প্রায় মাথার সমান। জমির আলে হাঁটলে সোনালি যবে ওর মাথা ঢেকে যাচ্ছে। তখন শুধু বাবার শরীর গাছের মাথার ওপর। রাস্তায় দু-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে বাবা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কথা বলার সময় কেমন বিনয়ী এবং অপরাধীর মত মুখ বাবার—অনলকে ওর মামার বাড়িতে রেখে আসছি। কথাটা যেন না বলতে পারলেই বাবা খুশি হতেন। কিন্তু একটুখানি ছেলেকে নিয়ে বড়বাবু কোথায় যাচ্ছেন এমন বললে, অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলা, যাচ্ছি ছেলেটাকে রেখে আসতে। বাড়িতে একদম পড়াশোনা করে না। অনল কাছে না থাকলে বাবা হয়তো এমনই বলতেন। কিন্তু অনল যেহেতু বাবা কথা বললে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেজন্য বাবা আর বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। সত্যি কথা বলে ফেলে বাবা। তখন অনলের কান্না পায় ভীষণ।

দরগার কাছে আসতেই সাগর বললে, আয় এখানে একটু বসি তুই হাঁটতে পারছিস না। কেবল পেছনে পড়ে থাকছিস।

বাবা প্রায় অনেক দূরে থেকে ডেকে ডেকে এমন কথা বলছিল। প্রায় তিন ক্রোশের মতো পথ হেঁটে এসেছে—আরও দু'বার গাছের নীচে ওরা জিরিয়ে নিয়েছে। এখানেও বেশ একটা সুন্দর জায়গা, লম্বা ইঁদারা। হিজিবিজি অক্ষরে কি সব লেখা। পাশটা সান বাঁধানো। চারপাশে কাঁফিলা গাছের বেড়া। মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে মসৃণ ঘাসের চত্বর। লোকজন নেই। দূরে একেবারে পশ্চিমে ছোট বেদীর মত কিছু এবং নতুন চুনকাম করা। বড় একটা বকুল গাছ পাশে। বকুল ফুল ছড়িয়ে আছে। তাজা বাসি এবং শুকনো বকুল ফুল। আর চারপাশে শুধু মাঠ, ফসলের খেত, দূরে

দূরে সব গ্রাম। শান বাঁধানো চত্বরে একটা মাটির কলসি। গলায় দড়ি বাঁধা। যেন লেখা থাকে নামাজের সময় পার হয়ে যায় মানুষের। কারা এখানে রেখে দিয়েছে মাটির কলসিটা। জল তুলে নামাজ পড়ে নিতে পারে ধার্মিক মানুষেরা। জলে কোনো অস্পৃশ্যতা নেই। এবং সাগর জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিল। অনলও জলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রোদের তাপ থেকে একটু ঠাণ্ডা হতে চাইল এবং তখনই বুঝতে পারছে অনলের মুখ রোদে পুড়ে গেছে! মুখের ওপর রোদ, কতকাল থেকে অনল যেন বাবার সঙ্গে রোদে পুড়ে এভাবে হাঁটছে।

বাবা একসময় বলল, খিদে পেয়েছে। খেয়ে নে।

অনলের মনে পড়ল, মা মুড়ি পাটালি গুড় দিয়েছে, রাস্তায় খেয়ে নেবার জন্য। কখন তারা পৌঁছাবে কে জানে।

সাগর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে?

অনল মুখ না তুলেই বলল, না বাবা।

মাথার ওপর তখন গাছের ছায়া। টুপটাপ দুটো একটা সাদা ফুল ঝরছে। বসন্তের হাওয়া—বেশ ঠাণ্ডা, গত বছর দুর্ভিক্ষের বছর গেছে। এ-সব অঞ্চলে খুব মানুষ মারা গিয়েছিল, এবং কলেরার প্রকোপে, গাঁ সব উজাড় হয়ে গেছিল।

সাগর বলল, দেখি হাত।

অনল হাত মেলে দেখাল।

পাটালি গুড় দিল হাতে।—আর একটু নিবি?

অনল বলল, না বাবা।

সাগর বুঝতে পারে ছেলেটার ভেতর চাপা অভিমান ক'দিন থেকে কাজ করেছে। বেশি কথা বলছে না। দুঃসময় যে ভীষণ ছেলেটা বুঝতে পারছে। তবু সে আশা করতে পারে নি, মা ভাইবোনদের ছেড়ে তাকে কখনও দূরে চলে যেতে হবে।

সাগর বলল, ওখানে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবি নীল। স্কুলে যেতে পারবি। কত বড় স্কুল। যদিও প্রায় ক্রোশখানেক দূরে স্কুল তবু বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, এত কাছে স্কুল আর কোথায় আছে এমন।

মুড়ি দু'মুঠো খেয়েই অনল বলল, আর খাব না বাবা। ভাল লাগছে না।

শুকনো মুড়ি, পাটালি গুড় দিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে, অথচ অনল খাচ্ছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে। সেই সকালে সূর্য উঠতে না বের হয়েছে। ক্ষুধায় চোখমুখ কাতর অনলের। অথচ খাচ্ছে না। ছেলের দিকে ভালভাবে তাকাতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কোনোরকমে বলল, লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। বিদ্যাসাগর মশাই কত ছোট বয়সে বাবার হাত ধরে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এসব বলে বোধ হয় সাগর সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল। গরীব মানুষের জন্য বিদ্যাসাগর মশাই এমন একটা সম্বল রেখে গেছেন তবু। নয়তো ছেলের হাত ধরে খাঁ-খাঁ প্রান্তরে বসে অক্ষমতার জন্য চোখের জল না ফেলে তার বোধ হয় উপায় ছিল না।

অনল বাবার কথা ফেলতে পারে না। বুঝতে পারছে সে না খেলে বাবাও আর খাবে না। ইদারা থেকে জল তুলে এনেছিল সাগর। সামান্য জল খেয়ে গলার শুকনো ভাবটা সে কাটিয়ে দিতে চাইল। অথচ অনল ভেবে পায় না এই গুড় আর মুড়ি বাড়িতে তার অমৃতের সমান ছিল। ভাগে কম পড়লে মার সঙ্গে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত। ওর মনে হত ইচ্ছে করেই মা তাকে কম দেয়। মা আজ ক'দিন থেকে ওকে সবচেয়ে বেশি তোয়াজ করছে। ভাল খাবার হলেই ওর জন্য বেশি বেশি রেখে দিত। ওদের জন্য সব পাটালি পুঁটলিতে মা বেঁধে দিয়েছে। মার দুঃখী মুখের কথা ভেবে কেন জানি আর বলতে পারছে না, আমার খেতে ভাল লাগছে না বাবা। আর খেতে পারছি না। খুব আগ্রহের সঙ্গে যেন খাচ্ছে,

খেতে খেতে বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। বাবা কিছুতে আর টের পাবে না তার খেতে কষ্ট হচ্ছে। জল সে খাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাবার দিকে তার মুড়ি ঠেলে না দিয়ে চোখ গোল করে প্রায় সবটা খেয়ে ফেলল।

সাগর বুঝতে পারছিল তারও খুব হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এতটা পথ সে অনেকবার হেঁটেছে। আজকের মতো এত ক্লান্তিকর কোনো রাস্তা আছে পৃথিবীতে তার জানা নেই। সে কেমন গাছের নীচে পুটুলি মাথায় খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকল। মাথার কাছে অনল বসে আছে। চুপচাপ। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। বাবার পেছনে সে প্রায় সবটা পথ দৌড়ে এসেছে। তবু কেন যে বাবার নাগাল পাচ্ছিল না। কেবল দেখেছে কিছুক্ষণ পরপর বাবার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সে দৌড়েও বাবাকে আর ছুঁতে পারছিল না।

দুই

রাতে পদ্মর ভাল ঘুম হয়নি। নীলদা আসছে। বাড়িতে সবার মুখ বিমর্ষ, কেবল ছোট দাদু তাকে গাছপালা এবং মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে নীলদা কেমন দুরন্ত হয়ে যায় তার কথা বলেছে। দাদুর কাছে সোনাপিসির গল্প, সোনাপিসেমশাইর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। তার পড়ার কথা মনে থাকত না। মা দাদুর মুখের ওপর কিছু এখনও বলতে পারে না। সে বুঝতে পারে ছোটদাদু সোনাপিসিকে ভীষণ ভালবাসে। আর মা যে কেমন সোনাপিসির কথা উঠলেই মুখ ভার করে থাকে। নীলদা আসছে, এখানে থাকবে শুনে মা মুখ ভার করে রেখেছে ক'দিন থেকে। মাকে সে আর আজকাল হাসতে দেখছে না। তার খারাপ লাগছিল নীলদার কথা ভেবে।

অন্য দিন রোদ না উঠলে তার ঘুম ভাঙ্গে না। আজকে সে সবার

আগে উঠে পড়েছে। এখানকার দিনগুলো কলকাতার মত নয়। একটা এঁদো গলিতে তাদের দু কামরার বাসায়, কখনও রোদের মুখ দেখা যেত না। ভ্যাপসা গরম আর অন্ধকার। শীতের সময় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। সর্দি জ্বর লেগে থাকত তার।

এখানে এসে অনেক কাজ বেড়ে গেছে। যেমন ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি কুয়োর জলে হাত মুখ ধোওয়া, ঠাকুর ঘর থেকে সাজি বের করে ফুল তোলা। ওর তখন আলাদা মনে হয় জীবনটা। অসুখে-বিসুখে একদম আর ভুগতে হয় না। ফুলের ভেতর সে আশ্চর্য সৌরভ পেয়ে গেছে বাঁচার। তারপর আবার নীলদা আসছে। নীলদাকে সে কখনও দেখেনি। নীলদা পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। কম বয়সে বেশি লম্বা হয়ে গেছে। নীলদার মাথায় কোকড়ানো চুল! নীলদার ইজের ছেড়ে দেবার বয়স এবং তার থেকে দু-এক বছরের বড়। যদিও মা বলবেন, তোর চেয়ে ওর বয়স তিন বছরের ফারাক, মা সব সময় কেন যে ওর বয়েসটা কমিয়ে রাখে বুঝতে পারে না।

সে সকালে গাছে গাছে ফুল তুলেছে। যাকে দেখেছে, বলেছে, আজ নীলদা আসবে। সোনাপিসেমশাই আসবে। সকালে ছোট দাদু বাজারে গেছে—ভাল মাছ আসবে, যেমন বড় সোনালি পাবদা। সোনাপিসেমশাই সোনালি পাবদার ঝোল খেতে খুব ভালবাসেন।

পদ্ম ঝুমকোলতার গাছে উঠে গেল। সাজিতে ফুল সাজিয়ে রাখল। শ্বেতজবা, চন্দন ফুল, অপরাজিতা এবং এ-সময়টায় দুটো একটা টগর ফুটব ফুটব করছে, সে নুয়ে যখন বুঝল এখনও ফোটেনি, তখন দামাল মেয়ের মত দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। রাস্তাটা পুকুরের পাশ দিয়ে দত্তদের আমবাগান পার হয়ে, সেনেদের অর্জুন গাছটার নীচে থেমেছে। কত রকমের সব পাখিদের বাস গাছে গাছে। আমের মুকুল আসছে, মৌমাছি উড়ছে, গাছের নিচে গিয়ে

দাঁড়ালেই সে তাদের গুঞ্জন শুনতে পায়। অবিরাম এক গুঞ্জন গাছে গাছে, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। তখনই কে যে ডাকল, পদ্ম আয়। সে চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। কেমন এক অপরিচিত মিষ্টি স্বর।

মা কুয়োতলায় জল তুলছে। পদ্ম তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে চলে গেল। পড়তে বসতে হবে। দাদার ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়। মা সকাল থেকেই শুরু করে দেয়, কিরে উঠবি না। কখন পড়তে বসবি। মার হয়ে দাদাকে ঠেলে ঠুলে তুলে দেওয়াও তার একটা কাজ সকালে। দাদাটা যে কি! সে ছুটে ঠাকুরঘরের পাশে চলে গেল। দরজা খুলে সাজিটা ভেতরে ঠেলে দিল। ঠুকঠুক করে দুবার মাথা ঠুকল চৌকাঠে। নিত্য সকালে সে এটা করে থাকে। ছোট দাদু তাকে এ-সব শিখিয়েছে। এবং এক দৌড়ে সে ঘরে ঢুকে ডাকল, এই দাদা ওঠ। তুই উঠবি না! কত বেলা হয়েছে! সে বালিস টেনে নিল। তবু উঠছে না। ঘর ঝাঁট দেবে, জল ছিটিয়ে দেবে, দাদা তবু উঠছে না। সকালে সধুন্য গোয়াল থেকে গরু-বাছুর বের করে ফেললেই, ফুলু পিসি গোবর বের করে নেবে। সারা উঠোনে এবং বাড়ির চারপাশে ফুলু পিসি গোবরছড়া দেবে। এর ভেতর দাদা না উঠলে, মা বকবে। সে দাদাকে টেনে প্রায় তুলে দেবার সময় বুঝল, মা রান্নাঘরে।

সে ডাকল, এই দাদা ওঠ। আজ নীলদা আসবে।

—ধুস্ তোর নীলদা। বলে সে ও-পাশের তক্তপোষে ফের গড়িয়ে পড়ল।

পদ্মর স্বভাব এমনিতেই ভারি নরম। তাকে কেউ পদ্ম বলে যখন ডাকে, যখন সে বারান্দায় তক্তপোষে পড়তে বসে অথবা সবার বাধ্য বলে যখন দাদু তাকে ভীষণ ভালবাসতে চায়, পদ্ম তখন আরও ভাল হয়ে যায়। অন্যদিন হলে যেভাবে হাতে ঝটকা মেরেছে দাদা, সে কেঁদেকেটে অস্থির করে তুলত। আজ কিছু বলল না।

দাদা পর্যন্ত কেমন ক্ষেপে আছে। সে চুপচাপ তার বইপত্র গুছিয়ে বারান্দায় পড়তে বসে গেল। পড়া ঠিক হচ্ছে না, কেন যে বারবার সে পূবের ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। ও-ঘরের পাশ দিয়েই মানুষজনেরা বাড়িতে আসে। থেকে থেকে সে এভাবে তাকাচ্ছিল আর গুনগুন করে, বেথ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে, পড়ছিল।

ফুলু পিসি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। সূর্য উঠে যাচ্ছে। গাছ-গাছালি ভরা বাড়িটার ভেতর তখন কুর্চি ফুলের মতো সব সাদা পায়রা উড়ছে যেন। ফুলু পিসির মুখে কখনও সামান্য রোদ কখনও ছায়া। মা রান্নাঘরে উনুনে শুকনো ডাল-পাতা গুঁজে দিচ্ছে। ঠাকুমা সিম-মাচানের নিচে উবু হয়ে বসে আছে। পূজোর দুর্বো তুলছে। দুর্বো তুলে ঠাকুমা কুয়োতলায় ঠাকুরের বাসন মাজতে বসবে। কোনো দিন সকালে গরম ফেনাভাত কৈ মাছ ভাজা। কোনোদিন দুধ-মুড়ি পাকাকলা গুড়। নীলদা আসছে, থাকবে, মা নীলদা থাকবে শুনে কেমন একটা নেই নেই, সংসারে অভাব অনটন বেড়ে গেছে মতো মুখে সবাইকে ডাক খোঁজ করছে। মাকে তার ক'দিন থেকে একদম ভাল লাগছে না। ছোট দাদুর ছেলে ন-কাকা অনেক টাকা পাঠায়, বাবা পাঠায় তবু মার মুখে হাসি নেই। মা কেমন ভয় পেয়ে গেছে যেন। পদ্মর কেন জানি কিছুতেই আজ আর পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ফুলু পিসি বলল, এই কি ঘ্যানর ঘ্যানর করছিস। স্পষ্ট করে পড়।

পদ্ম জোরে জোরে পড়ল। সে আঁক কসল, তখন দাদা হাই তুলতে তুলতে তক্তপোষে এসে বসেছে। মা রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে, মানু উঠেছিস। বেলা হয় না। তোরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দিবি!

পদ্ম চিৎকার করে বলল, মা দাদা উঠেছে।

—উঠেছে!

তবে আর কি! আমার রাজ্যোদ্ধার হয়েছে। দাদাকে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে যেতে বল। তুমি খেয়ে নাও।

খেতে বসে মানু দেখল, সেই দুধ কলা মুড়ি। বিরক্তিতে মুখ ভার হয়ে গেছে। খাচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে।

—খা দাদা।

—রোজ রোজ একঘেয়ে খাওয়া ভাল লাগে!

সহসা বজ্রপাতের মতো চিৎকার শোনা গেল। পদ্ম আড়ষ্ট চোখে লক্ষ্য করল মা প্রায় তেড়ে আসছে দাদাকে—তোমরা কি পেয়েছ আমাকে! খাবে না তো ফেলে দাও। কোথাকার রাজার ছেলে এয়েছেন। দুধ কলা একঘেয়ে। তবু তো জুটছে। দেখ না দিনকে দিন তোমাদের কি হয়।

পদ্ম বলল, খা না দাদা, দেখছিস না মা রেগে যাচ্ছে।

—এক থাপ্পড় মারব। আমি খাচ্ছি না তো তোর কি!

—মা রেগে গেলে জানিস না শরীর খারাপ করে।

—করুক। তেল মেখে মুড়ি খাব। দুধ মুড়ি খাব না।

—তোমার দুধ তবে কে গিলবে!

—দাও না মা, দাদা তেল মেখে মুড়ি খাবে।

হঠাৎ কেমন ক্ষেপে গিয়ে নলিনী ছেলের চুল ধরে টেনে তুলল। বলল, যাও বের হয়ে যাও। তোমায় খেতে হবে না।

কেন যে অকারণ এ সব অশান্তি পদ্ম বুঝতে পারে না। ঠাকুমা ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরেছে—তুমি বৌমা এত বড় ছেলের গায়ে হাত তোলো।

নলিনী কিছু বলছে না। ছেলের দুধ মুড়ি তুলে নিয়ে গেছে। এবং যা জেদ, হয়তো আজ আর নিজেও খাবে না, দাদাকেও খেতে দেবে না।

পদ্ম চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল। এখন মার কাছে-পিঠে থাকা খুব নিরাপদ নয়। বরং পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগী হয়ে

যাওয়া ভাল। অনেক বেলা পর্যন্ত পড়লে মার রাগ উবে আসে। সে এবার খুব উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করে দিল—কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন···

॥ তিন ॥

ছোট দাদু বললেন, এত বেলা হল, ওরা এখনও এল না দেখছি।

পদ্ম বলল, কতদূর দাদু ?

—তা চার ক্রোশের মতো পথ হবে। বলে এসেছিলাম, রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে। যা রোদ, খুব কাহিল হয়ে পড়বে ছেলেটা।

পদ্ম আজকাল দাদুকে নানাভাবে সাহায্য করতে ভালবাসে। সে দাদুর পূজার আয়োজন করে দেয়। ঠাকুমা নিরামিষ ঘরে তবে সকাল সকাল ঢুকতে পারে। ঠিক সময় সবাই খেতে পায়। সে বলল, একুশটা তুলসী-পাতা দিলাম। এবং কি যে হয়, মাঝে মাঝে কোথাও দাদু অমঙ্গলের আভাষ পেলে ঠাকুরকে তুলসী দেন। আজও দেবেন বলেছেন। বাজার থেকে বড় চাপিলা মাছ এনেছেন দাদু। কি তাজা আর রূপালী রং। মাছ এলেই পদ্মর ছুটে যাবার স্বভাব। সে পুঁটলি থেকে মাছ খুলে কাঁসার থালায় মেলে রাখতে ভালবাসে। সামান্য জল দিয়ে রাখে। তার মাছ কুটে দিতে ইচ্ছে হয়। মার জন্য পারে না। ফুলু পিশি তাকে কিছুতেই মাছ কুটতে দেয় না। সংসারে তখন তার অভিমান বাড়ে।

সারাটা সকাল দুপুর পদ্ম প্রায় ঘর বার হল বার বার। অড়হড় গাছের নিচে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কতবার। লোকজন কত গেল, বাজার করে যারা ফিরেছে তাদের ভেতর থেকে কেউ না কেউ হয়তো সহসা ঢুকে যাবে বাড়িটাতে। পেছনে সেই ছোট মানুষটি। তার সমবয়সী না হলেও খুব বড় নয়। এভাবে তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

আর এভাবেই পদ্ম দেখল দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। দাদু কিছুটা হেঁটে গিয়েছিলেন। দাদুর খালি পা, লম্বা সাদা পৈতা, চুল সাদা, হাঁটুর নিচে কাপড় নামে না দাদুর। ফিরে এসে বললেন, আসছে।

আর শোনা মাত্র, পদ্ম ছুটে এসে বলল, মা আসছে। নীলদা সোনাপিসে আসছে। ঠাকুমাকে বলল। ফুলু পিশি, দাদা সবাইকে সে ডেকেহেঁকে বলে গেল, আসছে। ওর গায়ে লতাপাতা আঁকা ফ্রক, এবং ছোট্ট বিনুনি দুলছিল পিঠে। এত হৈচৈর ভেতরও সে মার কোনও শব্দ পেল না। দাদু এসে ঠাকুমাকে বলল, বৌঠান, ওরা আসছে। পদ্ম ছুটে গেল পুকুরপাড়ে, তারপর আরও দূরে। এবং দত্তদের বাড়ি পার হয়ে কাছারি বাড়িতে নেমে গেল। সেখানে সে একটা লটকন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, খারে কাচা কাপড় জামা পরে একজন ক্লান্ত মানুষ। সে চিনতে পেরেই ডাকল, পিশেমশাই। পেছনে যে আছে তাকে দেখে, পলকে চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন সে ভারি অপরিচিত মানুষ। পিসেমশাইয়ের মতো সে নীলদা বলে ডেকে উঠতে পারল না। লজ্জায় সে কেমন গুটিয়ে গেল।

সাগর বলল, কিরে তুই এখানে?

পদ্ম কাছে গিয়ে পিশেমশাইর পুঁটলিটা তুলে নিতে চাইল হাতে।

সাগর বলল, তুই পারবি না।

পদ্ম বলল, দাও না। আমি পারব।

সাগর বলল, এই তো এসে গেছি। নীল, এই পদ্ম। তোমার মেজমামার মেয়ে।

অনলের নিজের মামা বেঁচে নেই। মামীমা বাপের বাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেছে। মেজ মামা ওর মার খুড়তুতো ভাই। ছোট দাদুর দুই ছেলে। ওরা কোথায় বিহারের দিকে থাকে। বড়-জন কয়লা খনিতে একটা কি বড় কাজ করে। এবং এই পরিবার

সম্পর্কে তার ধারণা এত কম যে পদ্মকে দেখে কেমন প্রথমে গুটিয়ে গেল। পদ্মর গায়ে সুন্দর ফ্রক। পদ্ম কলকাতার মেয়ে বলে ভারি ফিটফাট। আর ওর হাঁটু পর্যন্ত ধূলোতে সাদা মুখ, ভারি বিশ্রি হয়ে গেছে ঘামে ভিজে। আয়নায় সে মুখ না দেখেও টের পায়, মুখটা পুড়ে গেছে তার রোদে। ঘামের গন্ধ, যেন কাছে গেলেই বলবে, কি গন্ধ গায়! সে বাবার পেছনে, যেন পদ্ম ওকে দেখতে না পায়। পদ্ম আগে আগে যাচ্ছে, পুঁটলিটা কাঁখে নিয়েছে, পিসেমশাই তখন বলছেন—তোরা সবাই ভালতো, তোর বাবার চিঠি এয়েছে! ওঁর তো আসার কথা ছিল। পদ্ম খুব চটপট কথা বলতে পারে, যা বলার নয়, কখনও কখনও তাও বলে ফেলে, এবং অনলের থুক থুক করে হাসি পাচ্ছিল তখন। দত্ত বাড়ির নিবারণ দত্ত দেখে বলল, কি বড়বাবু অনেকদিন পর এদিকে আসা হল! পরিচিত আরও দু একজন মানুষ বাবার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে—এই আপনার বড় ছেলে?

বাবা বলছেন, আমার না ঈশ্বরের। যেন আমার বললেই ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ লেগে যাবে। তোমার কি হে, তুমি কে, তুমি তো নিমিত্তি মাত্র। বাবা ঈশ্বরকে খুব ভয় পায়। বাবা যত গরীব হয়ে যাচ্ছে তত ঈশ্বরকে বেশি তার ভয়।

চার পাশে খাঁ খাঁ রোদ ছিল, এখন এই গাছপালার ভেতর ঢুকে যেন জুড়িয়ে গেল শরীর। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বার বার কোথাও জল খেতে চেয়েছে অনল, সাগর বলেছে, আরে ঐ তো এসে গেলাম! বাবা অনেক দূরের পথ ঐ তো এসে গেছি বলে হাঁটিয়ে এনেছে। ছায়ার ভেতর ঢুকে ঝুপ করে বসে পড়তে ইচ্ছে হল অনলের। এক পা আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। পা দুটো কেমন ভারি আর নির্জীব।

বাড়ির পথে উঠে আসার সময় পদ্ম কথা বলতে বলতে কেমন চুপ মেরে গেল। সকাল থেকে মা যা আরম্ভ করেছে। সোন

পিসেমশাইর সামনে যদি কিছু হয়ে যায়। মাতো মাঝে মাঝে ভীষণ অবুঝ এবং নীলদার মুখের দিকে তাকিয়ে তখন কেন যে তার আরও মায়া বেড়ে যায়। যত মায়া বেড়ে যায়, এ বয়সে পিশিকে ছেড়ে নীলদার থাকতে কি যে কষ্ট সে বুঝতে পারে। সে তার ঈশ্বরকে বলল, ঠাকুর মার রাগ কমিয়ে দাও। মাকে তুমি হাসি খুশি রাখো।

আর আশ্চর্য পদ্ম, সে তখন দেখল দাদু বারান্দা থেকে নেমে এসেছেন, পেছনে মা। পিশেমশাই দাদুকে গড় হয়ে প্রণাম করছে। মাকে করছে ঠাকুমাকে করছে। মার মুখে কি উজ্জ্বল হাসি! মা ডেকে তাকে বলছে, মানু কোথায়রে। পদ্ম তুই প্রণাম করেছিস।

পদ্ম জিভ কেটে ফেলল। এক দৌড়ে সে এসে পিসেমশাইকে টুক করে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল, আবার টুক করে ছোট্ট ছেলেটার পায়ে ঢিপ-ঢিপ দুবার মাথা ঠুকেই ছুটে কোথায় হারিয়ে গেল। আর কেউ তাকে ডাকাডাকি করেও খুঁজে পেল না।

সাগর বলল, নীল, সবাইকে প্রণাম কর।

ছোট দাদু বললেন, এত বেলা হলো তোমাদের!

—যা রোদ। নীল হাঁটতে পারছিল না।

ছোটদাদু বললেন, একটু বিশ্রাম করে চান-টান করো। খাও। খুশির শরীর কেমন?

—ভালো।

ওরা সবাই পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় আছে। পুঁটলিটা কোথায় রাখল পদ্ম, এবং সেজ-দিদিমার উনুনে কি পুড়ে যাচ্ছিল, সেজ-দিদিমা তাড়াতাড়ি নিরা-মিষ ঘরে ঢুকে গেলেন। এইসব অপরিচিত মানুষের ভেতর অনলকে থাকতে হবে। সে বাবার কাছছাড়া হতে ভয় পাচ্ছিল।

বাড়িটা বেশ খোলামেলা। তিনদিকে বড় টিনকাঠের ঘর। উত্তরে সীমের মাচান, দক্ষিণে পাতকুয়ো। পেয়ারা গাছের নীচে

গোয়ালঘর। এ-পাশে ঠাকুরঘর। ঘরের লাগোয়া সব ফুলের গাছ। ভেতর বাড়িতে নিরামিষ ঘর, রান্নাঘর, ঘরের পেছনে বড় একটা জামরুল গাছ, এবং নীচে খাল। খালের পাড়ে বাঁশের জঙ্গল এবং আরও দক্ষিণে আমের বাগান। তারপর হাজামজা পুকুর, পুকুর পার হলে দক্ষিণের বাড়ি। গাছপালায় ঘেঁসাঘেঁসি করে সব বাড়িঘর মানুষেরা রয়েছে।

রাতে খেতে বসে মেজমামী বাবাকে বলল, বুঝলে সাগর, আমার তো এক ছেলে, বায়না অনেক। এটা খায়না, ওটা খায় না। দুধেভাতে খেতে চায় না। কি যে চায় বুঝি না। তোমার ছেলে তো দেখছি খুব ভাল, কথা কম বলে। শান্ত। সব তো সব সময় দিতে পারব না, পরে কথা হলে……!

—না না। কথা হবে কেন। দু বেলা দু মুঠো দেবেন। ওর কোনো কষ্ট হবে না। সাগর যতটা সহজে বলে ফেলল, যত সহজে সে স্বীকার করে নিল, চোখে মুখে তার কোনো চিহ্নমাত্র নেই। মাথা নিচু করে খাচ্ছে। অনল বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। লম্ফর আলোটা দপদপ করে জ্বলছে। ছোট দাদুর খাওয়া হয়ে গেছে। পদ্ম খেতে খেতে মার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। মানুদা কিছুটা খেয়েছে, কিছুটা ফেলেছে। দুধের বাটিতে দুধ, গুড়। বাবার সামনে দুধ, ওর বাটিতেও দুধ গুড়, খাওয়া শেষের মুখে। তখন, তোমরা খাও, আমি উঠি, বলে ছোট দাদু কিছুটা বিরক্ত মুখে উঠে গেলেন।

পদ্মর কি যে হয় তখন, সে মাকে খুব ভয় পায়—মা কত ছোট হয়ে যাচ্ছে—মার জন্য সেও যেন খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে—তার খেতে ইচ্ছে করছে না—সে বলল আমি আর খাব না। পেট ভরে গেছে।

মানু বলল, পিসেমশাই কাল থাকছেন তো। বড় পুকুরে মাছ ধরব।

সাগর যেন কিছুটা এ-কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, কাল সকালে যেতে হবে মানু। গ্রীষ্মের ছুটিতে যেও তোমরা।

পদ্ম বলল, থাকতে হবে।

অনলের ভারি ইচ্ছে ছিল বলে, থাকো। কিন্তু তার ভীষণ ভয় করছিল। সে বাবার মুখই ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। মেজ মামী দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলু মাসি গ্লাসে জল ভরে দিচ্ছে। সেজ-দিদিমা নিরামিষ রান্না বাটিতে রেখে গেছিল। সেটা খালি হলে নিয়ে গেছে। সুধন্য বাইরে খোলা উঠোনে কলাই করা থালাতে খাচ্ছে। মাথার ওপর জোনাকী উড়ছিল। এবং ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সে আর বলতে সাহস পেল না—বাবা থাকো, তুমি চলে গেলে আমি ভারি এক হয়ে যাবো। আমার কষ্ট হবে।

অনল চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। হাত মুখ ধুল কুয়োতলায়। পদ্ম জল তুলে দিচ্ছে। এবং সে অন্ধকারে রান্নাঘরের উঠোন পার হয়ে বাইরের উঠোনে দাঁড়াবার মুখে বুঝতে পারল বড় আমলকি গাছটা দুটো উঠোনের মাঝখানে সোজা বরাবর ওপরে উঠে গেছে। তার পাতা ঝরে পড়ছিল। অন্ধকারে দাঁড়ালে সে বুঝতে পারল, ছোট দাদু তামাক খাচ্ছে। ছোট দাদু অনলকে এখানে নিয়ে এসেছে। ছোট দাদুর মেয়ে ছিল না, মাকে ছোট দাদু মেয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। আর বোধ হয় এই গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে টের পেল, বড় দাদু মারা গেলে ভাইঝিটা অনাথা, মা নেই বাবা নেই মেয়েটাকে সর্বস্ব খরচ করে বিয়ে, ভাল ঘর ভালো বর তবু মানুষের কখন দুঃসময় আসে কেউ টের পায় না। ছোট দাদু বাবার দুঃসময় টের পেয়ে তাকে নিয়ে এলেন।

ছোট দাদু বললেন, অন্ধকারে কে? নীল?

অনল খুব পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

—কে নীল?

—আমি দাদু।

—এদিকে আয়। বোস। কেমন লাগছে?

অনল কিছু বলল না। বারান্দায় আলো ছিল না। অন্ধকারে

সে দাদুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দাদু একটা জলচৌকিতে বসে তামাক খাচ্ছে। সামান্য জ্যোৎস্না উঠোনে। অস্পষ্ট আলোতে সে পাশের একটা জলচৌকিতে চুপচাপ বসলে দেখতে পেল, কলকের আগুন দপ করে জ্বলে উঠেছে। দাদু চোখ বুজে তামাক টানছে। সে দাদুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। দাদু তামাক খেতে খেতে ভার নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। তামাকের গন্ধে সারাটা বারান্দা ভুর ভুর করছে।

দাদু তামাক টানছিলেন এবং সহসা জেগে যেন কিছু মনে এলেই বলে ফেলছেন, মাইল তিনেক পথ। হাঁটতে পারবি না ?

—পারব।

—অমূল্য কবিরাজকে বলেছি।

কি বলেছেন, আর কিছু বললেন না।

—কবিরাজ তোর বিনা বেতনে পড়ার একটা সুযোগ করে দেবে বলেছে।

অনল কিছু আর বলছে না। অমূল্য কবিরাজের নাম মার কাছে অনেকবার শুনেছে। সে এখানে খুব ছোটবেলায় এসেছিল। তখন দেখলে দেখতেও পারে···তার কিছু মনে নেই। স্পষ্ট নয় সব কিছু।

তিনি ফের বললেন, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। বিনা বেতনে পড়তে হলে পড়ায় ভাল হতে হয়।

বাবার গলা ভেতর বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে। ফুলুমাসি কি বলেছে, বাবা জবাবে কিছু বলেছেন। পদ্ম ঘরে হ্যারিকেন রেখে গেল। বারান্দায় আলো এসে পড়েছে। দাদু এখনও অন্ধকারে। কি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

দাদু ভীষণ লম্বা মানুষ, রোগা মতন। চামড়া ঝুলে গেছে। চোখের পাতা সাদা হয়ে গেছে। খড়ম পায়ে দেন বলে আরও লম্বা লাগে দেখতে। অন্ধকারেও দাদু তাকে দেখছেন। সে কিছু বলছে না দেখে আরও কিছু হয়ত বলবেন তিনি। সে বুঝতে

পারছিল এ-বাড়িতে তিনিই তার নিজের মানুষ। মাও বলে দিয়েছে কষ্ট হলে ছোট কাকাকে বলবি। তোকে দিয়ে যাবে।

ফুলুমাসি পুবের ঘরে লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছে। হাতে শেতল পাটি। বোধহয় বিছানা করতে যাচ্ছে। তার আর বাবার বিছানা। দিদিমা ঘরে এসেছেন। একবার উঁকি দিলেন, দিদিমার বয়স দাদুর মতো নয়, কম। এখনও শক্ত, বেশ নিজের রান্নাবান্না নিজেই করে নিয়েছেন। দাদু বললেন, বৌঠান নবীনকে লিখে দিতে বল, নীল এখন থেকে এখানে থাকবে। লেখাপড়া করবে।

অনল বুঝতে পারল না দাদু এত পরে কেন মেজমামাকে লিখতে বলছেন। হয়তো দাদু বিশ্বাস করতে পারেনি বাবা সত্যি সত্যি তাকে এখানে রেখে যাবে। বাবা খুব সহজে ছোট হতে চায় না। দাদু হয়তো জানতেন, মা যতই বলুক, বাবা শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না। আর রাজি হয়ে গেলেই বাবার ওপর মার কি অবিশ্বাস। বোধ হয় মা আর আগের মতো বাবাকে ভালবাসে না। রাতে বাবাকে যেভাবে বকঝকা করছিল আর বাবা চুপচাপ যেভাবে হজম করে গেছে—ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না সবকিছু—সে দাদুকে বলল, মা আপনাকে যেতে বলেছে।

—তোর গ্রীষ্মের ছুটি হোক। একসঙ্গে যাব। তুমি কিন্তু কান্নাকাটি করবে না। বেশিতো দূর না। বর্ষাকালে সুধন্য নিয়ে যাবে তোমাকে। শুকনো দিনে আমি। পদ্ম আছে, কিন্তু দাদু কেন যে মান্নুদার কথা বললেন না। মান্নুদাতো বাবাকে কাল থেকে যেতে বলেছে। অথচ মান্নুদার কথা দাদু যেন ইচ্ছে করেই বলছেন না। দাদু কি সব টের পান—কি হবে না হবে, কে তাকে কতটা ভালবাসবে তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারেন।

এ-সময় দাদুর পাশে এসে বাবাও বসে পড়ল। জোতজমির কথা আদায়পত্রের কথা বাবার কাছে জেনে নিতে চাইলেন দাদু। শরিকী মামলায় বাবা শেষ হয়ে গেল কথাবার্তায় সে তা বুঝতে পারছিল।

গ্নীর টাকা সব বাকি পড়ে গেছে। হক সাহেবের প্রণসালিশী বৌউ
ব একটা সুবিচার করছে না, এমন দুঃসময়ের কথা যেন বাবা স্বপ্নেও
াবেনি। বাবা খুব বেশি কথা বলে না, মামলায় হেরে গিয়ে আরও
পচাপ হয়ে গেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে বিলের অতবড় জমিটা
াতছাড়া হয়ে গেল। আসলে বাবা ঠিক সংসারী মানুষ না। কেমন
ামান্য উদাস ভাব। ছোট দাদু সব টের পেয়ে বুঝি শেষপর্যন্ত আর
বশি কিছু বলতে সাহস পেলেন না বললেন, শুয়ে পড়গে। বাবা
ঠে পড়লে বললেন, কদিন থেকে যাও।

বাবা কিছু প্রায় না বলেই উঠোনে নেমে গেলেন। খালি পা,
াবা খড়ম পায়ে চলে যাচ্ছে। অনল পরেছে স্যাণ্ডেল খড়ম।
াটতে গেলেই খটখট শব্দ হয়। ওরা দুজনে উঠে যাবার সময়
লুমাসি আলো ধরেছে। বাবা আসার সময় যা কিছু নতুন উপহার,
ই যেমন একজোড়া স্যাণ্ডেল-খড়ম, দুটো নতুন পেনসিল, একটা
বার আর কিছু জলছবি উপহার দিয়েছে অনলকে—অনল যাবার
ময় কেঁদে ফেললে, বাবা হয়তো মনে করিয়ে দেবে, তোমাকে আমি
ত কিছু দিয়েছি তারপরও কাঁদছ নীল।

একপাশে কাঠের পাটাতন, একপাশে তক্তপোষ। ছোট
নালা। বড় বড় গজারি গাছের থাম, আলকাতরায় রাঙ্গানো।
নলদের পাকা বাড়ি, কবে ঠাকুরদা যৌবন বয়সে করে গেছিলেন।
রপর আর ওর কলি ফেরানো হয়নি। কড়িবরগা খসে যাচ্ছে। ওদের
াবার ঘরটা তবু বাবা গত বছর চুনকাম করিয়েছিলেন। বাতাবি
বুর গাছ আছে একটা। পরে গন্ধপাদালের ঝোপ, কামরাঙ্গার
ল। এখানে সে জানালার ওপাশে কি আছে বুঝতে পারছে না।
ন অপরিচিত জায়গায় কেমন একটা ভয় আর আশঙ্কা। সে
কল, বাবা।

সাগর বলল, এদিকে শোও। জানালার কাছে আমি যাচ্ছি।

অনল বলল, বাবা, আমি একা শোব?

—একা শোবে কেন ?

—তুমি কাল থাকবে তো ?

—না নীল। কাল যেতে হবে। সাগর তারপর কি বুঝতে পেরে বলল, ছোট দাদুতো আছেন। সুধন্য ওপাশে শোবে। ভয়ের কি !

অনলের কেন জানি মনে হল বাবা তাকে ভালবাসে না। একা এমন একটা জানালার পাশে শুলে সে ভয়ে মরেই যাবে। চারপাশে নিশুতি রাতে সব নানারকম অপদেবতার ভয়। জানালায় হাত বাড়িয়ে যদি ডাকে, অনল আমরা। যাবে আমাদের সঙ্গে ! অথবা নিশির ডাক—সে শুনেছে ঘুমের ঘোরে কোথায় নিয়ে চলে যায়, হয়তো কোনো নদীর পাড়ে কোনো কবরখানায়, শ্মশানে হতে পারে এবং ওদের তো মায়াদয়া কম, ঘাড় মটকে গাছের মগডালে ঝুলিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। অভিমানে সে বলতে চাইল, তোমরা আমাকে আর খুঁজে পাবে না। ঠিক আমাকে ওরা ডেকে নিয়ে যাবে।

এবং এভাবে অনলের ঘুম আসছিল না। বাবা আর কোনো কথা বলছেন না। সে মাঝে মাঝে পাশ ফিরে শুচ্ছে। এবং কখনও চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ার মতো অথবা মরার মতো পড়ে থেকেছে। সুধন্য মেঝেতে বিছানা পেতেছে। সেও শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েই সুধন্যর নাক ডাকছিল।

বাবা বললেন, ঘুমোও।

বাবা টের পাচ্ছে সে ঘুমোচ্ছে না।

সেতো এতটুকু আর নড়ছে না। ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছে। কেবল থেকে থেকে মার মুখ—এই প্রথম সে মাকে ছাড়া। বাবার ঘরটা আলাদা। সে তার ছোট ভাইবোনেদের সঙ্গে বড় খাটে মার পাশে শুয়ে থাকত। ওর জায়গাটা ঠিক নিমু দখল করে নিয়েছে। ওর এভাবে সবার ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছিল সবাই মিলে যেন তাকে বনবাসে পাঠিয়েছে।

বাবা বলল, যাবার সময় কান্নাকাটি কর না। তুমি বড় হয়েছ।

নিশুতি রাত এভাবে তখন চারপাশে অন্ধকার ক্রমশ বিছিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছিল তারা। পুকুরে কোনো বড় মাছের ঘাই এবং দূরবর্তী মাঠে কিছু কুকুরের চিৎকার। গাছপালা সব মন্থর পায়ে যেন রাতের অন্ধকারে ক্রমে হেঁটে বেড়াতে শুরু করেছে। কিছু পাখির শব্দ, ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ, বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল গ্রামের মাথায়—পাখায় লটপট আওয়াজ – অনল শুয়ে শুয়ে সব টের পাচ্ছিল।

বাবা বললেন, ভাল মন্দ খেতে পাবে সব সময় ভেব না। যা দেবে তাই খাবে। নালিশ জানাবে না।

তখনই এক ঝাঁক শেয়াল একেবারে ঘরের কাছে ডেকে বেড়াচ্ছে —হুক্কা হুয়া। শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে মাটি। অনল ভয়ে আৎকে উঠেছে। ভয়ে সে শরীর শক্ত করে রেখেছে। রাতের এই বিরূপতার ভেতর মার মুখ, ছোট ভাইবোনদের আবদার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। তার ভেতর থেকে কান্না উঠে আসছে। যেন সে তাদের আর জীবনেও দেখতে পাবে না। তার আগেই হারিয়ে যাবে। সে কোনরকমে বলল, আমি সত্যি কাঁদব না বাবা।

গভীর রাতে অনলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কে যেন তার বড় বড় চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আদর করছে। ওর মুখে মাথায় কেউ যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল বাবার হাত। সে এতটুকু নড়তে পারছিল না। বাবা তাকে গোপনে আদর করছে। সে জেগে গেলেই বাবা হাত সরিয়ে নেবে। তারপর মনে হল বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবাকে জীবনে কাঁদতে দেখে নি। সেও বোধ হয় এবার কেঁদে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ে বলল, বাবা, বাইরে যাব। ভীষণ হিসি পেয়েছে।

সকালে বাবা চলে গেল। অনল গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। একা। বাবা দূরে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সে বাবার সঙ্গে হাঁটতে

হাঁটতে কাছারিবাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছিল। উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বাবা ধীরে ধীরে মাঠের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে সে দাঁড়িয়েছিল। কাছারিবাড়ির মাঠে একজন বুড়ি মতো মানুষ গরু দিতে এসেছে। সে ঠাস ঠাস করে খোঁটা পুতছিল। কিছু গ্রামবাসী—তারা চলে যাচ্ছে অস্তানা সাবের দরগা পার হয়ে। সে কাউকে চেনে না। বাবাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীতে সে একা নয়—বাবা দূরের মাঠে এখনও হেঁটে যাচ্ছে—ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছিল, রোদের ভেতর বাবা যেন পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে মিশে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল সত্যি সে এবার একা হয়ে গেল, কান্না আসছে বুক ঠেলে। বাবা বারণ করেছে। এখন কাঁদলে কেউ দেখতে পাবে না। সে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখনই কে যেন ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে ডেকে উঠল, নীলদা আমি এখানে।

অনল কিছুই দেখতে পেল না। পদ্ম এই গাছপালার ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চোখ জামার খুঁটে মুছে নিল।

—আমি কোথায় খুঁজে ছাখো।

—দেখতে পাচ্ছি না।

আর কোনো জবাব নেই। সামনে অজস্র মটকিলার ঝোপ বাঁশের ঝাড়। বাতাবি লেবুর বাগান ডানদিকে। দক্ষিণে সেনেদের পুকুর, বড় বড় চন্দনগোটার গাছ। হাওয়ায় ডালপালা দুলছে। পদ্ম কোথায় আছে কিছুতেই টের পেল না। সে ঝোপে জঙ্গলে শুধু তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকল।

—এই পদ্ম, তুই কোথায়? আমার ভয় করছে। ঝোপ জঙ্গলের ভেতর কোথাও উবু হয়ে পদ্ম তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

ঠিক পায়ের কাছে কে যেন তার সুরসুড়ি দিচ্ছে।—পদ্ম! উঠে দাঁড়াল। ফ্রক গায়ে পদ্মকে এইসব জঙ্গলে একটা ফুলপরী

মতো লাগছে। পদ্মর ফ্রক, বিনুনি এবং আশ্চর্য সরল চোখ অনলকে একটা নতুন জগতে নিয়ে যেতে চাইছে। সে বলল, কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি।

পদ্ম বলল, তুমি কাঁদছিলে কেন?

—যা কাঁদলাম কোথায়।

—আমি সব দেখেছি।

অনল লজ্জায় গুটিয়ে গেল। কিছু বলল না।

—আমি কাউকে বলব না। এস। হাত ধরে অনলকে নিয়ে মেয়েটা যে তখন কোথায় যেতে চায়! গাছের নীচে, যেখানে সব সরু সরু কাচপোকা অথবা সোনালি রংএর চন্দনবীচি পড়ে আছে—সেই সব মাড়িয়ে, সেনেদের এক লাল রংএর ঘোড়ার কাছে অথবা অর্জুন গাছে যেসব ফুল আসবে তার সংগ্রহে—মেয়েটার ভারি প্রীত হওয়ার স্বভাব। পদ্ম গাছপালা রোদ্দুরের ভেতর অনলের হাত ধরে কেবল একটা ক্রমিক ছবির মতো নিরন্তর ছুটতে চায়। ছুটতে ভাল লাগে। নীল আকাশের নীচে কোনো বড় মাঠে সহসা থমকে দাঁড়াতে বুঝি ইচ্ছে হয়। গ্রামের গাছপালা, অথবা ছাড়া-বাড়িতে কত সব খবর রয়েছে নীলদার জন্য, নীলদাকে সে তাই সেনেদের ঘোড়া দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই লাল রংএর ঘোড়া দেখলে নীলদা ঠিক হেসে ফেলবে। তার আর কোনো দুঃখ থাকবে না তখন। সে গোপনে আর কোনো নির্জন গাছপালার নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ভুলে যাবে।

॥ চার ॥

সকালে ছোট দাদু বললেন, চল অমূল্য কবিরাজের কাছে। বেলা বাড়লে ভিড় হবে। রোগী দেখার সময় কথা বলতে পারবে না।

অনল মাত্র বই খাতা নিয়ে বসেছে। পুবের ঘরটা এখন খালি। সুধন্য সকালে উঠে গরু-বাছুর নিয়ে জমিতে গেছে। ঝাঁপ তোলা। আম জাম হিজলের-ছায়া, পুকুর পাড়ে রোদ উঠেছে। একটু বেলা বাড়তে না বাড়তেই রোদ ভারি তেতে যায়। ছোট দাদুর বোধ হয় রোদে হাঁটতে কষ্ট হয়। সকালে কখন ছোট দাদু উঠেছে সে টের পায়নি। দাদুর পাশে একটা ছোট বিছানা, আলাদা মশারি—রাতে যতটা ভয় পাবে ভেবেছিল, সকালে দেখেছে, ভয় তো পায়ই নি, বরং কখন রাত শেষ হয়ে সকাল হয়েছে সে বুঝতেই পারেনি। দক্ষিণের বারান্দায় পদ্ম পড়ছে। মানুদা বসে বসে মটকিলার ডালে দাঁত ঘসছে। মুখে ভীষণ ফেনা উঠে গেছে তবু দাঁত মাজা শেষ হচ্ছে না। ছোট দাদু তখন ফের বললেন, ফিরে চল। এসে পড়বি খন। বেলা বাড়ছে।

ছোট দাদুর কদমছাঁট চুল, লম্বা পৈতা গলায় এবং হাঁটুর ওপর খারে-ধোওয়া কাপড়, কেমন একটা বুড়ো-বুড়ো গন্ধ শরীরে। রাতে শোবার সময় গন্ধটা নাকে এসে লেগেছিল। এবং তিনি দুটো একটা কথা বলেছিলেন ভূতদের সম্পর্কে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাকলে কেউ কাছে আসতে পারে না। তা ছাড়া বাড়িতে ঠাকুর দেবতা আছে—ভূতেরা এদিকে ঘেঁসতে বড় সাহস পায় না। চোর গুণ্ডাদের অনল ভয় পায় না। মানুষকে আর কি ভয়! ওদের ইচ্ছে করলেই ধরা যায়—কিন্তু ভূতেরা তো তা নয়, ওরা লুকোচুরি খেলতে বেশি ভালবাসে আর যাই করা যাক ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু এই বুড়ো মানুষ কাছে থাকলে সে ওদেরও খুব একটা ভয় পায় না। দাদুর সঙ্গে পুকুর পাড়ে নেমে এ-সব মনে হল তার।

সামনে দত্তদের আমবাগান। এবং মাঝে মাঝে বড় বড় সব রসুন গোটার গাছ। রসুনের মগডালে দত্তদের ছোট বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল। পদ্ম আরও সব খবর দিয়েছে তাকে—বেশি করে আস্তানা সাবের খবর। একমাত্র এই পীর মানুষটি গ্রামের শুভাশুভ

দেখছে। এবং কিংবদন্তীর মতো এই মানুষ অন্ধজনের দেহ আলোর মতো। ওলাওঠায় কি মহামারীতে তিনি গ্রামকে রক্ষা করছেন। কত লোক যে দুস্তর রাতে তাঁকে দেখেছে। লম্বা সাদা দাড়ি, বড় চুল, মাথায় ফেজ টুপি, কালো আলখাল্লা, গলায় সব রং-বেরংএর পাথরের মালা। হাতে মুসকিলাশান। প্রায় সব খবর, যত সব আশ্চর্য জায়গা আছে পদ্মর কাছে, এবং কলকাতা শহরের বাসট্রামের কথা, হাওড়ার পুল, চিড়িয়াখানা, আর কি যে কেবল বলে গেছে—সে এখন সব মনে করতে পারে না। দাদু তাকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কবিরাজের ঘোড়াটা সে কাল দেখেছে। ঘোড়াটার একটু দূরে ও আর পদ্ম অনেকক্ষণ উবু হয়ে বসেছিল

অনল ছবিতে ঘোড়া দেখেছে। আর দূরের মেলা দেখতে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখেছে। সব লম্বা লম্বা ঘোড়া, মেজেণ্টা রংএর। কালো সাদা অথবা লাল রংএর। একবার একটা মেলার ঘোড়া ওদের মাঠের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের সবাই, ছেলেবুড়ো বলতে কেউ বাকি ছিল না, ঘোড়াটা দেখতে মাঠে নেমে গিয়েছিল। এত লম্বা সাদা ঘোড়া দেখে বিস্ময়ে সে ঘোড়াটার পেছনে সব ছেলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়েছিল। কদম দিচ্ছিল ঘোড়াটা। গলায় ঘণ্টা বাজছিল। দুজন মানুষ পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে একটা লোক বসে আছে পিঠে। প্রায় রাজার মতো লাগছিল লোকটাকে। মোমিনপুরের ঘোড়া বাজি জেতার জন্য যাচ্ছে। কিন্তু সেনেদের ঘোড়াটা তেমন বড় নয়। ছোটও নয় খুব। এত কাছে থেকে সে কখনও ঘোড়া দেখেনি। এবং সে বুঝতে পারছিল একেবারে সে একা নয়, সঙ্গে পদ্ম আছে, মন ভাল না থাকলে ঘোড়াটা আছে। ঘোড়া দু-পা লাফিয়ে যখন ঘাস খেয়ে বেড়ায় তখন পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব ভাল লাগে।

তখন অমূল্য কবিরাজের ডিসপেনসারিতে রোদ উঠে এসেছে। পাশে ডাকবাকস গ্রামের। নীল রংএর খামের মতো পোস্টাফিসের

মাথায় টিনের চাল। দরজা খোলা। বুড়ো উপেন দত্ত ঝুঁকে আছে টেবিলে। পাশে খোলা আকাশের নিচে গাঁয়ের সব মানুষেরা ফসলের খবর চিঠিপত্র কি এল — ডাকের খবর এসব নিচ্ছিল। আর লাল রংয়ের ইটের বাড়ি অমূল্য কবিরাজের। জানালায় সাদা রং লম্বা বারান্দা, আব সামনে সবুজ ঘাসের লন। সাদা ফ্রক পরে জানালায় সুন্দব মতো দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে অনলকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

অমূল্য কবিরাজ ডিসপেনসারি ঘরে বড় তাকিয়াতে বসে আছে। বেশ সৌমকান্তি মানুষ। লম্বা। গায়ে ধবধবে সাদা ফতুয়া। ডিমের মতো মসৃণ মুখ। দুজন ছাত্র বড় উদখলে হামানদিস্তা গাছের শেকড়বাকড় পিষছে। বেশ একটা ছন্দের মত ওরা কাজ করে যাচ্ছে। ঢং ঢং ঢং—ঢন ঢন। চারপাশে কেমন শুধু শেকড় বাকড়ের গন্ধ। অথবা লতাগুল্মেব গন্ধে ঘরটা গমগম করছিল। বড় বড় কাচের আলমারি সাজানো। বাঁ দিকে বড় বড় স বোয়েম। এত বড় যে ইচ্ছে করলে সে কোনো বোয়েমের ভেতর চুপচাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। থরে থরে সাজানো সব মাটি জালা। কত সব যে গাছপালা, ফলমূল জড় করে রাখা। আ দক্ষিণের বাগানে সে একটা কি অতিকায় জীব দেখে অবাক হয়ে গেল। ঠিক ছাগল ভেড়া নয়, অন্য কিছু একটা জীব, থুতনিতে দাড়ি আছে।

অনল বলল, দাদু ওটা কি!

দাদু বলল, ওটা রামছাগল।

সে বলল, কি হবে?

—ওটার তেল লাগে কবিরাজী অষুধে। কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা রাতে ওটাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। তারপর তুলে, ছাল চামড়া খুলে বড় কড়াইয়ে জ্বাল দেবে। চর্বি বাতে বেদনায় কাজে লাগে।

অনলের খুব দুঃখ হচ্ছিল, কত আয়াসে চোখ বুজে ওটা জাব

কাটছে, পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না। গাছের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়—ঘুম পাচ্ছে মতো জাবর কাটছে—ওটা যদি জানত কোন এক অন্ধকার রাতে মাটি চাপা দিয়ে ওটাকে মেরে ফেলা হবে—এবং সেদিনটা এই গাঁয়ে ঠিক সবাই ঘুমিয়ে থাকবে, রোজ সকালে যাকে দেখা যায় গাছটার নিচে আর দেখা যাবে না—বোকা জীবটা তার কোনো খবরই রাখে না ভেবে কষ্ট হচ্ছিল তার, তখন কবিরাজ ডেকে পাঠাল, বলল, বড়বাবুর ছেলে তুমি ?

অনল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বড়বাবুর যে ছেলে এটা কি বলার কথা ! ছোট দাদু পাশের চেয়ারে বসে আছেন। দু-চারজন রুগী বাইরের বারান্দায় একটা লম্বা টুলে বসে আছে। সে কথা না বলায়, ছোট দাদুকে বলল, কোমরের ব্যাথাটা কেমন ?

দাদু এখন যেন তাঁকে দেখাতে এসেছেন, সঙ্গে সে রয়েছে। অনেক বেলা হয়ে গেল, পদ্ম ঠিক তার ঘরে দুবার ঘুরে গেছে—পদ্ম তাকে রামছাগলের খবর দেয়নি। পদ্মও ঠিক জানে না বোধ হয়। এবং কলকাতায় থাকলে গ্রামের আকাশ খুব ভাল লাগার কথা— সে কেন যে পদ্মর জন্য ছটফট করছিল। পদ্ম তাকে ইতিমধ্যেই একবার তিনটে তিলের নাড়ু এবং একবার ক্ষীরের সন্দেশ চুরি করে খাইয়াছে। মামীমার ভাঁড়ারে কোথায় কি অবশিষ্ট আছে পদ্মের চেয়ে কেউ ভাল জানে না। পদ্ম ওর ঘরে এসে ওকে খুঁজে না পেলে খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। আর কখনও চুপিচুপি তাকালেই অনলের মনে হয় পদ্ম ফ্রকের নীচে কিছু চুরি করে গুঁজে রেখেছে। ওকে কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে এবং দুবারই সে দেখেছে ঠাকুর ঘরের পেছনটা খুব একটা নিরিবিলি জায়গা, বড় বড় সব তালগাছ দু-তিনটে, তারপর পুকুর পাড়ের ঝোপ জঙ্গল, জঙ্গলেব ছায়ায় ঘরের পেছনে দুজন চুপচাপ সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ টের পাবে না, ওরা দুজন সকাল থেকে সেখানে লুকিয়ে ছিল। পদ্ম কিছু

নিয়ে এলেই সোজা ওকে নিয়ে সেখানে চলে যায়, নীলদা হাঁ করো, করলেই মুখের ভেতর নাড়ু ঢুকিয়ে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় যে যায় মেয়েটা। ওর হয় বিপদ। তাড়াতাড়ি খেয়ে মুখ মুছে সুবোধ বালকের মতো তখন তার না থাকলে চলে না।

অমূল্য কবিরাজ ছোট দাত্নকে বলল, লেখাপড়ায় কেমন?

—ভাল। বেশ ভাল। ওখানেতো তোমার মাইনর স্কুল আছে একটা। ওতো মাইনর পাশ করেছে। নিয়ে এলাম আমি। তুমি যদি স্কুলে ওর কিছু একটা করে দিতে পার। বাড়ি বসেই সেভেনের বই সব শেষ করেছে।

কবিরাজ কি ভাবল। তাকাল জানালা দিয়ে মাঠের দিকে। ছাড়াবাড়িতে ওর ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। সেই অনবরত ঢং ঢং ঢং ঢনা ঢন শব্দ উঠছে হামানদিস্তার—কানে তালা লেগে যাবার মতো। এবং এই শব্দ, সুদূর মাঠ থেকেও শোনা যায়—কারণ এমন একটা তীক্ষ্ণ শব্দ সারা গ্রামে এখন সবাইকে যেন জানিয়ে দিচ্ছে—মানুষের আরাম ব্যারামের জন্য শেকড়বাকড় পেষাই হচ্ছে। মানুষেরা অনেক দূর থেকেও জানতে পারে—গ্রামে বিখ্যাত কবিরাজ অমূল্য সেন তার নিয়মাফিক বড় তক্তপোষে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে, এবং বেলা বাড়লে সব বড় কলাপাতায় সবুজ ঘাসের ওপর শুকোতে দেওয়া হবে সব লাল নীল রঙের বড়ি। মাথায় হ্যাট পড়ে কবিরাজ ঘোড়ার পিঠে নানারকম সব বড়ি নিয়ে দূর দূর গ্রামে চলে যাবে রুগীদের বাড়ি। ফিরবে সেই বিকেলে। ফেরার সময় ঘোড়াটা কদম দিতে দিতে ধুলো উড়িয়ে যখন আসবে—তখন অনলের ইচ্ছে হয় বড় হলে সেও একটা ঘোড়া কিনবে। কবিরাজী অষুধ নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে যাবে। রোগ শোকে মানুষের কাছে সে অষুধ ফিরি করবে।

কবিরাজ বলল, তোমার কি নাম?

অনল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থেকেই নাম বলল।

কবিরাজ, দাছুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বড়বাবুর মুখ পেয়েছে। কবে এসেছিল ?

দাছু সব বললেন।

—একবার এল না!

—মনটা বোধহয় ভাল নেই।

—খুব কষ্টের ভেতরে আছে শুনেছি।

—তা আছে।

—খুশী তো আসেই না।

—না। অনেক্ বলেছি। আসে না। পাগল। সংসারে ভাল মন্দ কথা সব সময়ই হয়। ধরলে চলে!

অনলের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। সে অষুধের আলমারিতে নানা রং বেরংয়ের অষুধ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট সব শিশিতে কালো খুদে খুদে অক্ষরে সব অষুধের নাম লেখা। এবং উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। ওর কেমন বমি বমি পাচ্ছিল। অনল বলল, আমি যাই দাছু।

—যা। আমি আসছি।

অনল এক দৌড়ে বাইরে বের হয়ে এল। হামানদিস্তায় তখনও শব্দ—ঢং ঢং ঢং ঢনা ঢন। শব্দটা একনাগাড়ে, এবং কেমন মাতাল করে দেবার মতো। সে নেমেই সোজা ঘোড়াটা যেখানে ঘাস খাচ্ছে সেখানে দৌড়ে গেল। ছাড়াবাড়িতে ঘোড়াটা ছাড়া, নানারকম লতাগুল্মের ভেতর ঘোড়াটা একা। সামনে ছু পা বাঁধা। লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আর ঘসঘস শব্দহচ্ছে খাওয়ার। মাঝে মাঝে ফোঁত ফোঁত করছে। সে কাছে যেতেই চোখ তুলে তাকাল ঘোড়াটা। সে বলল, আমার নাম অনল। পদ্ম আমাকে নীলদা বলে ডাকে।

তখন সাদা ফ্রকপরা একটা মেয়ে কোথা থেকে ডাকল, অনল তুমি ওখানে কি করছ ?

অনল দেখল ঠিক পেছনে একটু তফাতে ওর বয়সী একটা ছোট্ট মেয়ে। সে বুঝতে পারল অমূল্য কবিরাজের মেয়ে। মেয়েটা ওকে দেখেই নেমে এসেছে। কি সুন্দর মুখ চোখ। চুল ঘাড় পর্যন্ত, চুলে যেন প্রায় মুখটা ঢেকে গেছে। রেশমের মতো চুল বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছিল। ওদের ঘোড়াটা সে দেখছে বলে মেয়েটা আবার নালিশ দিতে পারে। সে যদি দুষ্টুমি করে ঘোড়াটার সঙ্গে; মেয়েটা না থাকলে সে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়তে পারত ঘোড়াটার দিকে। ওর ইচ্ছে ছিল, ঘোড়াটা ঘাস না খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকুক। এবং কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই আর একবার তাকায় নি। তাকালেই যেন সে ওর কাছে ছুটে যেতে পারত, পায়ের দড়ি খুলে দিতে পারত, তারপর মাঠে নেমে সারা দিনমান সে আর এই লাল রঙের ঘোড়া—কিন্তু সব টের পেয়ে গেছে ছোট্ট মেয়েটা। মেয়েটা আবার তার নামও জানে।

অনল বলল, কিছু করছি না আমি।

মেয়েটা কাছে এসে বলল, আমার নাম মিলি।

অনল বলল, আমাকে পদ্ম নীলদা বলে ডাকে।

মিলি বলল, আমিও তোমাকে নীলদা ডাকব। তুমি এখানে থাকবে। আমি সব জানি।

—কে বলেছে ?

—পদ্ম। পদ্ম আমাকে সব বলেছে।

পদ্ম তবে সবার কাছেই খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। নীলদা আসছে। নীলদা আমাদের বাড়িতে থাকবে। আর কাকে কাকে বলে রেখেছে পদ্মর কাছে খবরটা নিতে হবে। তখন ফের মিলি বলল, ঘোড়াটা আমার কথা শোনে।

একটা ঘোড়া, তাও লাল রঙের ঘোড়া ছোট্ট মেয়েটার কথা শোনে—ভাবতেই সে বড় বড় চোখে মিলিকে দেখল।

মিলি বলল, বিশ্বাস করছ না বুঝি দেখবে। বলেই সে ছু লাফে

সে একা একা স্নান করে এল পুকুর থেকে। এবং যখন খেতে
ল দুরকমের খাবার দুজনের থালায়। আগে ভীষণ একটা
ভিমান বুক বেয়ে উঠত। এখন ওঠে না। সে তাকিয়ে একবার
ধু চোখ তুলে দেখে। বড় কই মাছ একটা আস্ত ভাজা মান্নুদার
াতে। মুসুরির ডাল। ওর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা
চুপচাপ খেয়ে উঠে যায়। এবং সে দেখতে পায় পদ্ম লুকিয়ে
খে গেছে সে কি খেল। পদ্ম আর লজ্জায় তখন কাছে আসে না।
নলেরও কি যে হয়ে যায়! রাগটা সবার ওপর তখন। মা বাবার
মনে পড়ে যায়। চোখ চিকচিক করে ওঠে। তখনই হাঁক, কি
তার হল!

—এই যে হয়েছে! বই খাতা পেনসিল বুকে করে সে নেমে
সে উঠোনে। মান্নুদা আর ডাকে না। সব ছাড়াবাড়ি, দত্তদের
ড়, কবিরাজ এবং ঘোষপাড়া পার হয়ে মাঠে নামলেই দেখতে
আটদশ জন ছেলে, সব দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। দল
ধে ওরা স্কুলে যায়। সামনে মাঠ খাঁ খাঁ করছে। প্রায় যেন
ার্চ করে অনল সবার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। জ
রু আলের ওপর দিয়ে প্রায় ব্যালেন্স রেখে
স দেখছে তার নাম প্রায় সবাই জানে। ত পারছিল না
ঠক মতো। খালি পা তার। চষা জমির য় হাঁটতে গেলে
ভীষণ লাগছে। সবাই কিছু না কিছু ক। সে একটাও
কথা বলছে না। কেউ কথা বললে। যেমন অবনী
লল, পারবি তো রোজ যেতে।

সে বলল, হ্যাঁ।

—প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হবে। হতে চাইবে না।
া ধরে যাবে। পা ধরলে বলবি কটু বসে নেব।

সে বলল, আচ্ছা।

—তারপর যখন রপ্ত হয়ে যাবি, তখন আর একদিন কামাই করতে ইচ্ছে হবে না।

অবনীকে অভিজ্ঞ মানুষ ভেবে সে বলল, কেন?

—আরে রাস্তার তুধারে দেখ কত ফসলের ক্ষেত। মাসে মাসে জমির রঙ পাল্টে যায়। দেখবি আর অবাক হয়ে যাবি। ঐ তো সামনে গোপের বাগ। আমের গুটি আসছে গাছে, পরে পাবি সনকান্দার মাঠ, মাঠ পার হলে নদী, তারপর আমিনপুরের বিল। বিলে এখন জল ভাঙ্গতে হয় না। সব শুকিয়ে গেছে।

ওরা দক্ষিণমুখো শুধু হাঁটছে। জমি তেতে গেছে। ঘাম হচ্ছিল। মুখে রোদ পড়ছে। এবং কালো হয়ে যাচ্ছে সবার মুখ। সনকান্দা পার হতেই অবনী কেন যে আলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। পাশে ক্ষেতি শশাব জমি—অজস্র ফলে আছে। অবনী এত বেশি মুয়ে গেল যে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সে যখন ফিরে এল, ওর কোঁচড়ে আট দশটা শশা। এবং নিমেষে ভাগ ভাগ হয়ে যার যার পকেটে চলে গেল। অনল বুঝতে পারছে অবনী দলটার [illegible] অবনীর বাবার অলিপুরার বাজারে ডিসপেনসারি [illegible] বাড়িতে বাজারের সব সেরা জিনিস আসে। ওর বাবার মুখ [illegible] ডাক্তার জীবনপ্রভা ধর ওর বাবা। সে কিছু একটা করে ধরা [illegible] তার আসে যায় না। বাবার নামে তাঁর সব মুকুব হয়ে যা[illegible] অবনীকে অনলের কেন জানি এতবড় রাস্তায় ক্যাপ্টেনে[illegible]হ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওর পকেটে অবনী শশা ঢোক[illegible]খল পকেটই নেই। —কিরে পকেট নেই কেন? বে[illegible]

সে বলল, দ[illegible]াখি।

—না! দে[illegible] দেখলে টের পাবে আনোয়ারের বাবা। বাবাকে না[illegible]অবনী তারপর কি করবে যেন ভেবে পায় না।[illegible] পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। দেখল

পকেটটা ভীষণ ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে। আনোয়ারদের বাড়ির সামনে অবনী পকেট জামার আড়ালে রাখছে। তারপর কোনরকমে ওদের বড়ি পার হয়ে আবার মাঠে পড়তেই অবনী বলল, টিফিনে নিবি। এটা আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। একটু সমঝে চলবি।

মান্নু দা তখন হাঁকছে, এই নীল এত পেছনে পড়ে আছিস কেন। দৌড়ে আয়।

তারপর ওরা তুজনে দৌড়ে দলটাকে ধরে ফেললে কেমন সবাই একেবারে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, হু রে! এতক্ষণ ওরা সবাই নিরীহ গোবেচারা মতো মুখ করে রেখে ছল। যেন ওদের মতো ভাল ছেলে হয় না। আনোয়ারদের বাড়ি পাশ দিয়ে রাস্তা। আনোয়ারের বাবা হাঁক পাড়বে—কি কর্তারা পকেট ভারি নেই তো। ওরা মুখ এমন সরল অনাড়ম্বর করে রেখেছিল যে আনোয়ারের বাবা কিছুই বলতে আর সাহস পায়নি। অনলের অভ্যাস নেই বলে ভয় ভয় করছিল তার। যদি তাকে ধরে ফেলে—কি কর্তা পকেটে এটা কি? শশা! শশা চুরি করেছেন ক্ষেত থেকে। নালিশ দেব। আর তখনই বাবার মুখ মনে পড়ে যায়। বাবা বলেছে ভাল হয়ে থাকবে। মামীমাতো একটা ছোটখাটো অজুহাত [illegible]র রক্ষা রাখবে না। এ-ছেলেকে রেখে কে তুর্নামের ভাগি[illegible] বংশের মুখে কালি। অনল সেজন্য কিছুতেই মুখ সরল অন[illegible]রে রাখতে পারেনি। সে খুব তুঃখী মুখ করে রেখেছিল—এ[illegible]রে ধরা পড়লে যেমন মুখ হওয়ার কথা হুবহু প্রায় তেমন [illegible]র রাস্তাটা অতিক্রম করে এসেছিল এবং আসবার মুখেই এ[illegible]া তেড়ে এসেছিল—যেন সেই মোরগটা তাকে ঠুকরে দে[illegible]ঠে নেবে যখন সবাই হুররে দিচ্ছিল তখন সে দেখছিল, দূ[illegible]টা থেকে কেউ নেমে ওদের ধরতে আসছে কিনা। সে প্রায় [illegible]ফিয়ে সবার পেছনে চলে গিয়েছিল। এবং কতক্ষণে স[illegible]ন জমি, পেঁয়াজ রসুনের ক্ষেত পার হয়ে যাবে বুঝতে [illegible]। ওর পকেটে

শশা নেই, সে এদের থেকে আলাদা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

তারপর আমিনপুরার কাছে সেই কাঠের পুলে উঠে গেলে দেখেছিল গাছে অজস্র সব হনুমান। গাছগুলোতে দলে দলে বসে আছে। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছে। একটাতো ওর গা ঘেঁষে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে গেল। অবনী, বলরাম, হৃদয় অনেক করে শশা ধরে রেখেছে। হাতে থাকলেই প্রায় কেড়ে নেবে। এ-জায়গাটায় কেন যে এত হনুমান থাকে। আর আশ্চর্য অন্য কোথাও যায় না। এদের সে অন্য জমিতে এই যে প্রায় দেড় ক্রোশের মতো মাঠ ভেঙ্গে এসেছে কোথাও দেখেনি এবং পানাম স্কুলের রাস্তাটা সে দেখল কি বড় আর প্রশস্ত। বড় বড় মাঠ-কোঠা, ইটের সান বাঁধানো বাড়ি তারপর এক সু উচ্চ লম্বা পাঁচিল, পাঁচিলের ভেতর প্রায় তিন চার একর জুড়ে সব ভিনদেশী ফুলের বাগান এবং ওপরে তারকাঁটার বেড়া, আশ্চর্য সব ফুলের গন্ধের ভেতর সে দেখতে পেল পোদ্দারদের সদর গেট। সামনে বন্দুকধারী সিপাই—এবং প্রাসাদেব মতো রাজবাড়ি। রাজবাড়ি পার হলেই গঞ্জের মতো হাট, হাটের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সেই শ্যাওলা [illegible]র স্কুলবাড়ি। ঢং ঢং করে সেই ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে ওর বুকটা [illegible]ড়াস করে উঠল।

ক্রমে এই বিদ্যাল[illegible] অনলের ভারি প্রিয় হয়ে গেল। এই দীর্ঘ পথ যাতায়াতে [illegible]াকল না রোজ দেড় ক্রোশ হেঁটে তাকে স্কুলে যেতে হয়। ব[illegible]য় ঐ তো গোপের বাগ, গ্রীষ্মের দিনে আম জাম জামরুল গ[illegible]ই ফলে থাকে— তাদের দলটা অনেক দূর থেকে হাতে ঢেলা নি[illegible]হেঁটে যায়; বোঝাই যাবে না এই সব নিরীহ বালকেরা বি[illegible] যাচ্ছে। মান্নুদা একটু বেশি বয়সে পড়ছে। পড়াশোনা ক[illegible]দার একদম ভাল লাগে না। এই যে স্কুলে নিত্যদিন সে যা[illegible] যেন এমন একটা পথের আকর্ষণে। সে যেতে যেতে [illegible]ার গল্প করে। মোটরগাড়, ট্রাম বাস

এবং একদিন মানুদা একা ট্রামে চড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে চলে গিয়েছিল এসব বললে অনলের মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে যায়—মানুদার সব ছোটখাটো ম্যাজিক আছে, কখনও পড়ন্ত বেলায় ফেরার সময় তাদের ম্যাজিক দেখায় মানুদা। কখনও রুমালের ম্যাজিক। মানুদার এ-সবে যত টান তত পড়াশোনায় মন্দ স্বভাব। সে কেমন ক-দিনেই মানুদাব খুব অনুগত হয়ে গেছে এবং সে বুঝতে পারে কি যেন একটা দুঃখ আজকাল মানুদা পোষণ করছে মনে মনে। একটা চিঠি সে দেখেছিল, মানুদা লিখেছে ডলিকে। ডলি মিলির দিদি। ডলি মাঝে মাঝে ঢাকা শহর থেকে চলে এলে মানুদার চোখে কেমন ঘুম থাকে না। সঙ্গোপনে মানুদা তখন কি যে করে বেড়ায়!

এবং এই পথটা সে দেখেছে বছরের শেষদিন পর্যন্ত কোথাও না কোথাও কিছু আকর্ষণ রেখে দিয়েছে। গ্রীষ্মের দিনে ক্ষেতি শশা কখনও টমেটো তুলে নেওয়া অথবা ফুটি তরমুজের সময় চুপচাপ পাতার আড়ালে বসে যখন একটা আস্ত মেজেন্টা রংএর তরমুজ ওরা গোপনে খেয়ে ফেলে তখন আর পৃথিবীতে কোনো দুঃখ আছে সে বুঝতে পারে না। অথবা বর্ষাকালে সে দেখতে পায় আদিগন্ত মাঠ, ধানক্ষেত, পাটের জলা জমি, এবং পাট কাটা হলে কখনও রূপোলি জলের দীঘি, কত সব অজস্র শ্যাওলা, শাপলা শালুক, শাপলা জলে ভেসে থাকলে গভীর জল থেকে নৌকার ওপর বসে শাপলা তুলে নেওয়া তারপর ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাওয়া, এবং সে ছোট বলে সবার মতো লগি ধরতে পারে না, তার কাজ শুধু শাপলা তুলে সবাইকে সরবরাহ করা। সে থাকে নৌকার ডগায়, উপুড় হয়ে পড়ে থাক। দেখতে পায় ডালিম ফুলের মতো পরিচ্ছন্ন বর্ষার জল, গভীরে কত সব ছোট মাছ শ্যাওলার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। রূপোলি চাঁদা মাছ, এ-ভাবে মাছের ঝাঁকের ভেতর অজস্র শ্যাওলার ভেতর কি এক নিদারুণ ভয় থাকে যেন কোথাও কোনো বড় ময়াল অথবা তার চেয়ে

কঠিন কোন সরীসৃপ মনে হয় তক্ষুণি ভেসে উঠবে—তখন সে আর জলের গভীরে তাকাতে পারে না। তার ভয় লাগে।

ধানের খেতে বর্ষায় আল-পড়ে যায়। নৌকা চলে। ধানের গাছগুলো হেলে দুলে ওদের পথ ফাঁকা করে দিতে চায়। কাঠে ঘসা লেগে শব্দ ওঠে ছড় ছড়। কত রকমের কীট পতঙ্গ যে উড়ে আসে আর পাটাতনে ওরা বসে থাকে। গোটা পৃথিবীটা জলে ডুবে আছে মনে হয়—এবং গ্রামগুলো থাকে দ্বীপের মতো জেগে। পুরো পথটা তখন বর্ষার জলে ভেসে যেতে হয়। কখনও কি রোদ, আবার মেঘেরা আসে ধেয়ে। চারপাশ অন্ধকার করে এলে ওরা ছাতার নিচে কজন প্রাণী চুপচাপ জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। বৃষ্টি ছাড়লে নৌকা ছাড়া হয়, ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে যায় কোনো দিন। তখন আস্তানা সাবের দরগার মাথায় কোনো নক্ষত্র দেখতে পেলে মনে হয় আজ আর বৃষ্টি হবে না। সকালে সূর্য উঠবে।

শরতের ছুটিতে অনল বাড়ি চলে যাবে। সুধন্য নৌকা ঘাটে ঠিকঠাক করছে। পদ্ম কাল ওর জামা প্যাণ্ট সব ধুয়ে দিয়েছে পদ্মর এসব করার কথা না। ফুলু মাসি ওর ঘরদোর নোংরা, আর সুধন্য থাকে বলে আসতেই চায় না। ছোট দাদুর বিছানাটা পেতে দেওয়া ছাড়া আর তার এঘরে কাজ নেই। ফুলু মাসি ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। এবং পদ্ম ওর ময়লা জামা প্যাণ্ট লুকিয়ে সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। যেন সে নিজের ফ্রক প্যাণ্ট ধুচ্ছে সাবান ঘসে—এভাবে কাজ কর্ম সারছিল। অনল ডুবে ডুবে মাছ ধরছিল পুকুরে। সুধন্য তাকে জলে ডুবে কি করে মাছ ধরতে হয় শিখিয়েছে। সে মাছ ধরে জলের ওপর ভেসে ডাকছে—পদ্ম ধর। পদ্ম কিছু বলতে পারে না। এই দুপুরে মাছ নিয়ে গেলে পিসি রাগ করবে—মা বকবে, কে কুটবে মাছ—সময় অসময় নেই, সে তবু বলতে পারে না, তারও যে কি হয়, মাছ কুড়োতে তার ভীষণ ভাল লাগে। ছুটে ছুটে বেড়ায় মেয়েটা, পাড়ে লাফায় মাছেরা। ট্যাংরা মাছগুলো

ভীষণ বজ্জাত, পুট করে কাঁটা দিয়ে কেমন কোঁ কোঁ করতে থাকে আর লেজ নাড়তে থাকে। কাঁটা খেলে চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে যায়। মাকে বলা যাবে না, বললেই পিঠে পড়বে—ধিঙ্গি মেয়ে তোমাকে কে বলেছে ওর সঙ্গে মাছ ধরে বেড়াতে, নৌকা ছাড়ার সময় পদ্ম এসে ঘাটে দাঁড়িয়েছিল। বড় গাব গাছ মাথার ওপরে। অনল বসে আছে পাটাতনে। ছই নেই। কোষা নৌকা। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। ছোট দাদু সুধন্যকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছে। সুধন্য চিঠিটা ওর জ্যাবে রেখে ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দিল। পদ্মের চোখ কেমন ছলছল করছে এবং যতদূর দেখা যায় সে দেখেছিল পদ্ম গাছের নিচে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাছপালার ভেতরে খালে খালে নৌকা মাঠে পড়লেই যে আকাশটা নিত্যদিন মাথার ওপর ভেসে থাকে তেমনি ভেসে থাকল।

মাঠে এখন ধান গাছ ঘন, থোড় আসছে ধানের। এবং ঘন সব ধানগাছের ভেতর নৌকা ঢুকছে না। সুধন্য খাটো একটা কাপড় পরেছে। হাঁটুর ওপর মাল কোঁচা মেরে সুধন্য লগি মেরে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে, খালে খালে ঘুরে যাবে বোধহয় সুধন্য। এবং অলিপুরার বাজারে পড়লে নদী, নদীতে পাল তুলে দিলে বেশি সময় লাগবে না। আর এভাবেই সে বিকেলের আলোতে নদীতে নেমে গেল। দুপাশে সব গ্রাম এবং গঞ্জ। কত সব পাখি, আর কত সব নৌকা, কোনোটা পাটের, কোনোটা খড়ের। গঞ্জের দু পাশে সব বড় বড় তাল আর আনারসের নৌকা লেগে রয়েছে।

অনল বাড়ি যাচ্ছে। মায়ের মুখ, ছোট ভাইবোনদের কথা ভেবে ভীষণ খুশি। তখন কেন যে সেই সুন্দর মুখ পদ্মের, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মর ছলছল চোখ ওকে কষ্টের ভেতর ফেলে দেয়। সে বলল, সুধন্যদা আমাকে কবে আবার নিয়ে আসবে?

—পূজা হউক তারপর।

—তুমি সুধন্যদা নদীতে মাছ ধরেছ?

—কত।

—একবার আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে।

—ভয় পাবেন।

—কেন ভয় পাব। তুমিতো আছো।

—সে এক আজব কাণ্ড কর্তা। দু-দিন জলে ভাসি থাকতে হয়। সহস্র হাতের তল জলের নিচে। সব বড় বড় মাছ সমুদ্দুরে আসে। জলের তলার মাছ, মানুষের তার ভারি ভয়। বড় বড় চাইন মাছ তবে লেগে যায় বঁড়শিতে!

এ পাঁচ সাত মাসেই সুধন্য তার কাছে প্রায় রাজার মতো হয়ে গেছে। সুধন্য তাকে রাতে পড়া শেষ হলে চুপচাপ লণ্ঠনের আলো কমিয়ে কিসসা শোনায়। অথবা কোন মাঠে কত বড় মাছ পাওয়া যায়, বর্ষার জলে কি মাছ ভেসে আসে, একবার মাছ ধরতে গিয়ে রাতে কি-ভাবে সে ভূতের উপদ্রবে পড়ে গিয়েছিল – কি-ভাবে সব মাছ ভূতেরা খেয়ে গেছে, চুপড়ির ভেতর সব মাছের মাথা মুণ্ডহীন, চিবিয়ে খেয়েছে মুণ্ডু সব এবং এসব কাজে বড় ওঝা না হলে চলে না, সে এক দৌড়ে মাঠ ভেঙ্গে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর কালু মিঞার ডাক খোঁজ এবং সেই থেকে সুধন্য আর রাতবিরেতে একা মাছ ধরতে যায় না। কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে এবং এমন সব অজস্র গল্পের ভেতর এক অজগর সাপের গল্প তার ফিরে ফিরে আসে। সুধন্য সব গল্পের শেষে একবার সে কি করে কবিরাজ বাড়ির বন্দুক দিয়ে একটা অতিকায় মেঘ-ডুম্বর অজগর সাপ মেরেছিল তার গল্প বারবার না বলে পারে না।

—অজগরটা খুব বড় না সুধন্যদা?

– সে এলাহি কাণ্ড নিলু কর্তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবা না। বললে তুমি ভাববে কিসসা।

—কত বড়?

– সে প্রায় – তুমি কখনও গেছ ঢালিদের পুকুরে?

অনল এ ক'মাসেই গ্রামের সব মুখস্থ করে ফেলেছে। কোথায় কি আছে—যেমন সে জানে সরকারদের সেই লম্বা আমবাগান পার হয়ে গেলেই কাশের জঙ্গল প্রায় যতদূর চোখ যায় সে দেখেছে, কাশের জঙ্গল ঘন সবুজ হয়ে আছে এবং সে একবার পদ্মকে নিয়ে পথটা ধরে গেছিল। ওরা দুজনে কাশের জঙ্গলে ঢুকে গেলে আর বের হবার পথ পায় নি—কেন যে গেছিল, এবং মনে পড়ছে, হাঁস দুটো বাড়ি ফিরে না এলে ভয়, কারণ এ ক'মাসেই তার ওপর কিছু কাজের ভার পড়েছে। এসব দেখেশুনে রাখা তার দরকার। হাটবারে ছোট দাদু, সুধন্য হাটে গেলে সন্ধায় গরু বাছুর মাঠ থেকে সে নিয়ে আসে। হাঁস দুটোকে সন্ধ্যায় সে ডেকে ডেকে নিয়ে আসে। এবং এক সন্ধ্যায় সে এসে দেখেছিল, হাঁস দুটো পুকুরে নেই। সে একটা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বের হয়েছিল—এবং যেতে যেতে সে কেবল ডাকছিল আয় তৈ তৈ। চারপাশে তখন অন্ধকার—ঝোঁপে জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে—সে লণ্ঠন হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছে না। অন্ধকার রাতে গাছগুলো কি গভীর কালো কালো দৈত্যের মতো একা দাঁড়িয়ে থাকে—আর কোনো গাছের নিচে গেলেই খস্ খস শব্দ। কারা যেন পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়ায় অন্ধকারে—। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে—গাছের নিচে হেঁটে গেলে মনে হয় টুক করে একটা লম্বা হাত নেমে আসবে মগডাল থেকে, এবং চুল ধরে ওকে ওপরে টেনে তুললে কেউ টের পাবে না, এই গাছের মগডালে অনল নামে ছেলেটাকে কে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। আর এ-ভাবে যখন অজস্র ছায়া অন্ধকার নিরিবিলি হাঁটাহাটি করে বেড়ায় তখন সে আর না বলে পারে না, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম এবং এ-সব নামের ভেতর সে যেহেতু জানে ভূতেরা কাছে আসতে ভয় পায়, সে বুকে তার এঁকে দেয় বড় বড় করে হরে কৃষ্ণ হরে রাম। সে কখনও উচ্চস্বরে গান গেয়ে ওঠে—যত অন্ধকার নিবিড় হতে থাকে যত গাছপালা গভীর নিঝুম

হয়ে যায় তত সে আস্তে আস্তে ডাকে—আয় তৈ তৈ। হাঁস শেয়ালে নিয়ে গেছে ভাবতেই গলা শুকিয়ে যায়—ছটো হাঁস যখন এ-ভাবে বনবাদাড়ে লুকিয়ে থেকে অনলের সঙ্গে মজা করছিল, যখন অনল ভয়ে আর একদম পা ফেলতে পারছে না, শরীর ফুলে উঠেছে তখনই গাছের অন্ধকারে সুন্দর মতো একটি মেয়ে—ঝোপে জঙ্গলে ফুলপরী মেয়ে দেখে সে প্রায় চিৎকার করে দৌড়াবে ভেবেছিল—তখনই সেই ভুতুড়ে অবয়বে ফুলপরী মেয়েটা ডেকেছিল—নীলদা আমি। আমি পদ্ম।

ভূতেরা কত কি যে ছলনা জানে। পদ্মর রূপ ধরে তারা কেউ হয়তো ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। ভূতেরা সুন্দর ছেলে মেয়েদের মাথা চিবিয়ে খেতে ভালবাসে—এক লহমায় কেমন শিরশির করে সব ভাবনাগুলো অনলকে গ্রাস করতে থাকলে—সে আর এক পা নড়তে পারেনি। প্রায় বাজপড়া মানুষের মতো লণ্ঠন হাতে সে দাঁড়িয়েছিল। পায়ে হাতের সব শক্তি কেমন নিমেষে উবে গেছে। সে বোধ হয় সংজ্ঞা হারাতো! তখন পদ্ম দৌড়ে এসে বলেছিল, এই দ্যাখো আমি পদ্ম। বিশ্বাস হচ্ছে না। হাঁসছটো বাড়ি গেছে। তুমি বাড়ি চল। ও সোজাসুজি বাড়ি ফিরবে বলে পদ্মকে নিয়ে কাশ বনে ঢুকে গেছিল, ছোট মতো একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। অনেকটা হেঁটে মনে হয়েছিল—ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। পদ্ম বলেছিল, তুমি এস নীলদা। শুনতে পাচ্ছ না—ঠুং ঠাং শব্দ।

নীল বুঝতে পেরেছিল, পদ্ম ঠিকই বলেছে। কবিরাজ বাড়ির হামানদিস্তার শব্দ। শিকড়বাকড় ঠুকে ঠুকে অমূল্য কবিরাজের ছাত্র মানুষের অসুখ নিরাময়ের জন্য অসুধ বানাচ্ছে। ওর সব ভয় কেমন নিমেষে উবে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, পদ্ম তোকে আজ মারবে।

—মারবে কেন?

—তুই একা একা অন্ধকারে চলে এলি।

—বারে মাত্তো জানে আমি পালেদের বাড়িতে লুটের বাতাসা নিতে এসেছি। এবং অনল শুনতে পেয়েছিল তখন, তুলসী মঞ্চের নিচে পাড়ার ছেলেপেলেরা জড় হয়ে গান গাইছে। ঈশ্বরের গান। সারা আকাশে বাতাসে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ শব্দ সব মালার মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। পদ্ম পালিয়ে এসেছে এক ফাঁকে। এবং এ-ভাবেই পদ্মের জন্য কেন জানি অনলের ভারি মায়া বেড়ে যায়। সে আর পদ্মকে একটা কথা বলতে পারে নি। অন্ধকারে ঝোপ-জঙ্গল পার হয়ে সে লণ্ঠন হাতে পদ্মকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

সুধন্য বলল, কর্তা কি ভাবতাছেন।

অনল তাকাল সুধন্যর দিকে। নদীতে নৌকা চলছে, পালে বাতাস লেগেছে। জল কেটে নৌকা আপন মর্জি মতো যেন চলছে। সুধন্য বৈঠার হাতল ধরে রেখেছে। এবং চারপাশের এমন জলরাশি তাকে কেমন উন্মনা করে দিচ্ছে। সুধন্যর কথার কোনো জবাব দিল না অনল।

—এত বড় মেঘ-ডুম্বর সাপের খোলসটা দিয়ে কি হল জানেন?

অনল বলল, না।

—চর্বি সব জমা গেল কবিরাজ মশাইর বোয়ামে। অষুধে লাগবে। ছাল শুকিয়ে বিকি গেল চোদ্দ টাকায়। কলিকাতার বাবুরা ফটাস ফটাস করে হাঁটবে। চটি জুতার কাজে লেগে গেল খোলসটা। কি আলিসান অজগর। বলেই সুধন্য আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য নেমে যাচ্ছে মজুমপুরের বিলে। ডাইনে বাঁক, লাধুরচরের খালের ভেতরে নৌকা ঢুকিয়ে দিতে পারলে ঝড় তুফানে নৌকা ডুববে না। সে বলল, কর্তা সাপটার মাথায় আমি, মাঝে পাঁচ ছয় জন, লেজের দিকটায় কবিরাজের ছাত্র নিবারণ। সাপটা মরেও মরে না। সারা গ্রাম ঘুরে অজগব দেখিয়ে পয়সা পেয়েছি। তারপর ভোজ। আপনের গিয়া অর্জুন গাছটার নিচে পেট কেটে দু ফাঁক করে রাখা হল অজগরটাকে—আমরা ঢালিদের

ছাড়াবাড়িতে খিচুড়ি লাবড়া খেলাম। পেরায় মচ্ছবের সামিল আর কি!

একটা অজগর সাপ, সুধন্য অথবা বর্ষার নদী কেমন অনলকে নানারকমের রহস্যের ভেতর নিয়ে চলে যায়। সাপটার মাথায় মণি ছিল কিনা কে জানে। সেই অজগরের মতো, রাজপুত্র আর কোটাল-পুত্র যায় আর যায়। মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে নদী সমুদ্দুর পেরিয়ে সেই এক দেশে রাজকন্যে আছে, রাজকন্যে মাথায় সোনার কাঠি পায়ে রূপোর কাঠি নিয়ে ঘুমোয়। এক অজগরের নিঃশ্বাসে রাজ্যের সব শেষ। কেবল বেঁচে আছে রাজকন্যে। দীঘির পাড়ে বড় অশ্বত্থ গাছের নিচে রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখেছে। রাতের নিশুতি অন্ধকারে আকাশে সব নক্ষত্র জ্বলছিল। দূরে মসজিদের মিনার, পাশে নদীর জল, সামনে দীঘি আর শুধু অন্ধকারে নিরিবিলি হয়ে আছে সমস্ত পৃথিবী তখন আলোতে ঝলমল করছে সারা মাঠ আর অজগর আসছে ধেয়ে। সাত রাজার ধন এক মানিক তখন আকাশের নিচে জ্বলে। অজগরটা এসেই তখন ঘোড়া দুটো আস্ত গিলতে আরম্ভ করেছে। কি করে কি করে—সেই রাজপুত্র চুপিসাড়ে এসে ঘোড়ার মলমূত্রে ঢেকে দিল সাত রাজার ধন এক মানিক। অজগরটা অন্ধকারে আর দেখতে পেল না কিছু। দাপাদাপি করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকল। কে জানে নীল নিজেই ছিল কিনা সেই রাজপুত্র! এমন একটা অজগরের গল্প সে যে কতবার শুনেছে। আর মনে হয়েছে তরবারি হাতে সে তখন দীঘির জলে নেমে যাচ্ছে। মানিকের আলোয় দীঘির ভেতর এক সিঁড়ি তার অন্ধকারে রাস্তা। সে আর কোটালপুত্র। কেবল পাতালে নেমে যাচ্ছে সেই রাজকন্যে উদ্ধার করতে।

সে বলল, সুধন্যদা অজগরের মাথার মণি থাকে না?

—থাকে, কখনও থাকে। কখনও থাকে না।

ওর বলতে ইচ্ছে হল তুমি খুব বোকা সুধন্যদা, সাপটার মাথা

যেখন তোমার জিম্মায় ছিল, তখন মুখ টিপে ওর গলা থেকে উগলে আনতে পারতে মানিকটা। অজগর মরে গেলে শরীরের ভেতর তার সাত রাজার ধন এক মানিক গলে যায়, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তুমি হাতের কাছে এমন সুযোগ পেয়ে জীবনটা নষ্ট করে দিলে। তারপরই কেমন সে দেখে ফেলল পদ্মর মুখ। গাছের নিচে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। আর অনেক দূরে বাতাসের ভেতর ঝিলমিল করে ভাসছে আর একটা মুখ। মিলি যেন জানালায় পাতলা সাটিনের ফ্রক গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, সুধন্যদা আকাশে মেঘ। ভারি বৃষ্টি নামবে।

সুধন্য বলল, খালে ঢুকে গেলে কোথাও পাড়ে ঘরটর পেয়ে যাব। শরতের বৃষ্টি আসে যায়। থাকে না। তখন নৌকো ছেড়ে দেব।

ক্রমে আকাশের মেঘ আরও ঘোলা হয়ে উঠছে। অন্ধকার আকাশের নিচে বোঝা যায় না কত বেলা, সূর্য ডুবতে কত দেরি। এতক্ষণ পালে বাতাস ছিল, তাও এখন নেই। চারপাশটা থমথম করছে। গাছের পাতা নড়ছে না। নদীর জল শান্ত। দুটো একটা ডিঙ্গি বাদে চারপাশে আর কিছু চোখে পড়ছে না। ঝড়ের আভাস পেয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেছে।

কড়কড় করে বিদ্যুৎ চমকাল। এদিক ওদিক বজ্রপাতের শব্দ। খালের মুখে দনদির হাট। হাটবার হলে চারপাশটা নৌকা গাদাগাদি করে থাকত। সুধন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে নদী থেকে নৌকা খালে ঢুকিয়ে দিতে। জলে ওর জামা কাপড় ভিজে গেছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে সুধন্য। ওর হাতের পেশী ফুলে উঠেছে। এবং চারপাশটা দেখে কেমন সামান্য আতঙ্কিত সুধন্য। একটা কথা বলছে না।

অনল বলল, ঝড় এসে গেল সুধন্যদা।

মেঘেরা তখন মাথার ওপর আরও নেমে এসেছে। যেন

অন্ধকারে আচ্ছন্ন আকাশ। অনল, কি করবে বুঝতে পারছে না। হাটের চালাঘর, পাটের গুদাম, কিছু তাল আনারসের নৌকা এবার দেখতে পেল অনল। কোনরকমে পাড়ে তখন শুধু ভিড়িয়ে দেওয়া। ছোট নৌকা বলে, প্রায় কোনো জলযানের মতো নৌকা চালাচ্ছে সুঁধন্যদা। আবার বজ্রপাতের শব্দ। যেন মাথার ওপর এসে আকাশটা ভেঙ্গে পড়ল। সুধন্য লগি মাথায় বসে পড়েছিল। অনল একেবারে নুয়ে গেছিল মাচানে। বিদ্যুতের মালা গাছের শিকড়-বাকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

আর আশ্চর্য ঝড়ো হাওয়া সহসা কোত্থেকে নেমে এল এবং কোনো রকমে সেই ঝড়ে ফের পাল তুলে সুধন্যদা কেমন মারমুখো হয়ে গেল, অতিকায় এক দানবের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে পালের দড়ি বেঁধে। যে কোনো সময় ওকে অথবা অনলকে উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু অনল বুঝতে পারে, ঝড়ো হাওয়াটা ভারি অনুকূলে তাদের। প্রায় একটা সামান্য খড়কুটোর মতো নৌকাটাকে নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল বাঁশের সাঁকোটার পাশে। কাঠের পাটাতন এদিক ওদিক ভেসে গেল। ভারি ঠাণ্ডা বাতাস, আর শিলাবৃষ্টি। বড় বড় পাথরের মতো সব বরফের টুকরো অবিরাম একটা দুটো করে পড়ছে। ওরা দৌড়াচ্ছে। নৌকা টেনে পাড়ে তুলে ওরা দৌড়াচ্ছে, সুধন্য অনলের পুঁটুলি হাতে নিয়ে প্রায় রক্ষাকারী মানুষের মতো অনলকে বলছে—কর্তা ছোটেন। খালি মাঠে পড়ে থাকলে আমরা মরে যাব। আকাশ থেকে ভগমান সব পাথর ছুঁড়ছে।

॥ ছয় ॥

মিলি দেখল তখন ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। জানালা দরজা সব বন্ধ। সে দক্ষিণের জানালা খোলা রেখেছে। বাবা রুগী বাড়ি বের হয়েছে সকালে। দু-চারদিন কি

মাস বাবা বাইরে বাইরে ঘুরবে। নৌকায় আছে রহমান মিঞা, ছোট পানসি নৌকা। পাটাতন লম্বা। বর্ষার আগে রং করা হয়েছে। ছইয়ে কারুকাজ করা বাঘ হাতির ছবি। সঙ্গে রান্নাবান্না করবে বলে হরদয়াল গেছে। বাবার ফিরতে দু-চারদিন কি মাস হয়ে যাবে। নৌকায় নানারকমের বোয়েম, কাচের জার এবং সব লাল নীল রংয়ের বড়ি—বাবা ঘাটে ঘাটে, গাঁয়ে গাঁয়ে অষুধ ফিরি করতে বের হয়ে গেল। আর বাড়িতে এখন আছে শুধু নিবারণ, সেই তখন সব বাবার হয়ে অষুধপত্র দেবে। ঘোড়াটা দেখাশোনার জন্য আছে করিম চকিদার। রাতে সে গাঁ-গঞ্জও পাহারা দেয়। দিনমানে ঘোড়া দেখা, ঘাস কাটা ঘোড়ার জন্য, আর মার আজ্ঞাবহ দাস করিম চকিদার। নীল রংয়ের ডাকবাকসে বাবার চিঠি আসবে কাল পরশু। চিঠিতে ঝড়বৃষ্টির কথা থাকবে।

এবং আকাশ থেকে তখন সাদা ফুলের মতো সব বরফের ছোট বড় টুকরো নেমে আসছে। ফুলের পাপড়ির মতো উড়ে এসে পড়ছে। আকাশ কি অন্ধকার আর কালো। গাছের ডালপালা সব প্রায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে যেন। সোঁ সোঁ বাতাসের গর্জন, কখনও ঝাপটা মেরে দরজা জানালা ভেঙ্গে দিতে চাইছে। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছিল। ঘোড়াটার পা বাধা বলে ছুটতে পারছে না। ঠিক অর্জুন গাছের নিচে এসে কি করবে ঘোড়াটা ভেবে পাচ্ছে না। শিলা-বৃষ্টির জন্য হতে পারে। সে ডাকল, আলো। এদিকে। ঝড়ের দাপটে কিছু শোনা যাচ্ছে না, সে ছুটে বের হয়ে গেল। দুটো একটা শিল এসে পড়ছে। সে যেতে যেতে দুটো একটা শিল ঠিক যেন খৈ ফুটে ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাসে, সবুজ ঘাসে, মনোরম লাগছিল—তবু মিলি এক দণ্ড দাঁড়াতে পারল না। মা ভেতরে, নিবারণদা তার শেকড়-বাকড় হামানদিস্তা, এবং সব গাছ-গাছালি যা রোদে শুকোচ্ছিল, সব তুলে নেবার জন্য ছোটাছুটি করছে। আর মিলি তখন দৌড়ে ঘোড়াটার পা থেকে

দড়ি খুলে একেবারে সোজা বারান্দায় উঠে দেখল, শিলগুলো আরও সব অতিকায় হয়ে যাচ্ছে। ঘাসের ভেতর তারা সব জমা হয়ে কেমন ক্রমে বরফের বল হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে ঘন অন্ধকারের ভেতর গাছপালা, মাঠ অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। ডিসপেনসারি ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে বসে আছে নিবারণদা। মুষলধারে বৃষ্টিপাত আর ঝড়, লণ্ঠনের আলোতে কেমন মায়াবী এক জগত—মিলি চুপচাপ টেবিলে বসে আছে বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছে। ওর পড়তে ভাল লাগছিল না। নীলদা নৌকায়, পদ্মকে সে দেখেছে বিকেলে কেমন মনমরা। নীলদা না ফিরলে পদ্ম আর হাসবে না। আর এ ভাবে তারও কেন জানি মনে হয় নীলদা কেন যে বাড়ি গেল! পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরে নীলদাকে নিয়ে যে কত কিছু করবে ভেবেছিল! এখনতো বর্ষাকাল, ঘোড়াটা ছাড়া-বাড়িতে থাকে, বাবা বাড়ি নেই, বিকেল হলে সে নীলদাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতে পারত।

এই সব গ্রাম-মাঠের ওপর দিয়ে তখন শরতের মেঘেরা ভেসে যাচ্ছিল। ক্রমে শিলাবৃষ্টি কমে আসছে। সবুজ সব গাছপালা আর মাঠের ওপরে আশ্চর্য নিভৃত আকাশ। আর বৃষ্টিপাতের শব্দ! সুধন্য বলল, বাঁচা গেল।

চুপচাপ মুখ গুঁজে অনল বসে রয়েছে। ওর জামা প্যাণ্ট শুকাচ্ছে দড়িতে। সে একটা কাপড় পরেছে। চাদর গায়ে দিয়েছে। চালের গুদাম। ফুরফুর করে গন্ধ বের হচ্ছে সেদ্ধ ভাতের। গলায় কণ্ঠি পরে আছে শিরিস মাঝি। ঝড়ে পড়ে আশ্রয় নিয়েছে।

নদীতে থাকলে নৌকা ডুবি হত—এবং ঠাণ্ডা আর শিলাবৃষ্টিতে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। টিনের চাল, শিলাবৃষ্টিতে ঝম ঝম শব্দ, বাইরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেও সুধন্য সাড়া পাচ্ছিল না। বড় বড় সেই পাথরের মতো আকাশ থেকে সাদা বরফের বল উড়ে এসে পড়ছে। মাথায় একটা পড়লেই

সংজ্ঞা হারাবে তারা। এবং শেষে সুধন্য জোরে প্রায় যত জোরে সম্ভব দরজা ভেঙ্গে দেবার মতো হামলে পড়েছিল। শিরিস মাঝি দরজা খুলে হাঁ। ঝড়ে পড়ে কারা আশ্রয় চাইছে। শীতে চোখ-মুখ সাদা, অপরিচিত তুজন মানুষ। এবং সব খবর পেয়ে বলল, রাতে আর যেয়ে দরকার নেই। তুটো ডাল ভাত সেদ্ধ, কর্তা সব করে দিচ্ছি, আপনি নেড়ে নামাবেন শুধু। বামুনের ছেলে, কিসে কি দোষ ঘটে যায় প্রায় পবম গুরুদেবের মতো নীলুর জন্য রান্না। বেশ রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল নীলুর। আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ আর ঘি। কাঁচা লঙ্কা গাছ থেকে তুলে এনেছিল শিরিস মাঝি। ঝমঝম বৃষ্টিপাতের শব্দেব ভেতর নীল আসনপিঁড়ি করে খেতে বসেছিল। ওর গলায় সাদা পৈতে। যজ্ঞোপবীতের মতো পবিত্রতা ওর মুখে। শিবিস মাঝি বুড়ো মতো মানুষ, ধার্মিক, করজোড়ে বসেছিল হাত পেতে। একটু প্রেসাদ বাখবেন কর্তা। পাতে বসে খাব।

নীল ফিক করে হেসে দিয়েছিল।

শিরিস মাঝি বলল, কর্তা ছোট সাপও সাপ বড় সাপও সাপ।

সুধন্য দূরে বসেছিল। ঝিমঝিম কখনো রিনরিন শব্দে বৃষ্টিপাতেব ধারা নেমে আসছে। দবজা বন্ধ। একবার সুধন্য দরজা খুলে আকাশের অবস্থা কেমন, ঝড় বাদলে ক্ষয়-ক্ষতি কিছু যদি হয়ে থাকে, অথবা সাঁকোর নিচে নৌকার হাল তবিয়ত কেমন দেখার বাসনা হলে, তার মনে হল, ঝড়ের দাপট কমেছে। লণ্ঠন হাতে তবু যাওয়া যাবে না। বাতাসে নিভে যাবে। প্যাচপ্যাচে কাদা ভেঙ্গে ওর আর বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে দরজা বন্ধ করে ফেব নীলু কর্তার খাওয়া দেখতে থাকল। নীলু কর্তা কেমন লজ্জা কবে খাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোতে নীলুকর্তার মুখ ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তখন পদ্মর ঘুম আসছিল না। ঝড় বাদলে নৌকা ডুবির ভয়। মা পাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঠাণ্ডায় সব নিঝুম। পদ্মর শীত-শীত করছিল। সে পায়ের কাছ থেকে চাদর টেনে নিল। তারপর

জানালা সামান্য খুলে আকাশ দেখতে থাকল। কোথায় কি ভাবে নীলদা আছে, এমন একটা ঝড়-তুফান এসময়ে হবে সে ভাবতেই পারে না। ভেতরে কেমন বুক ঠেলে কান্না আসছিল। সে বসে থাকল জানালার পাশে। একটা ছুটো নক্ষত্র যদি কোথাও দেখা যায়। গাছের ডালপাতা ছায়াব মতো দুলছে। সে ঈশ্বরের কাছে নীলদার জন্য প্রার্থনা কবছিল। কখনও সে মিথ্যে কথা বলবে না, সে রোজ সকালে উঠে ঠাকুব প্রণাম করবে—ফুল তুলে রাখবে এবং ভীষণ ভক্তিমতী হয়ে যাবে—এ-সব বলছিল।

সকালে ছোট দাদু দেখলেন, পদ্ম শেফালি গাছের নিচে বসে ফুলের মালা গাঁথছে। মেয়েটার ভীষণ দেবদ্বিজে ভক্তি। কেউ ওঠেনি. বৃষ্টিতে উঠোন ভেজা, ফুলগুলি কাদা মাখা, পদ্ম একটা একটা. ফুল আল্গা করে তুলে তুলে নিচ্ছে আর চুপচাপ কোনোদিকে তার দৃকপাত নেই—মালা গেঁথে যাচ্ছে।

ছোট দাদু গোয়ালের দিকে যাচ্ছিলেন।

এদিক ওদিক ভাঙ্গা ডাল, পাতা, উঠোনময়। কুয়োতলাতে বড় একটা কদমের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। ঘাটের কাছে একটা পিটকিলা গাছ শেকড়সুদ্ধ উল্টে পড়েছে। চারপাশে ঝড়ের দাপটের চিহ্ন। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই। পদ্ম মালা গেঁথে কুয়োর জলে ধুয়ে রাখল তখন সাজিতে। আর যা ফুল আছে, গাছে গাছে সে অন্বেষণ করে বেড়াল। একটা ফুলও সে আর গাছে রাখল না। সে সব ফুল নীলদার নামে ঈশ্বরের পায়ে দেবার জন্য ঠাকুর-ঘরে বড় সাজিতে তুলে রাখল। তাকে ভারি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সকাল থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক। একটা কথা বলছে না। সে কথা বলতে গেলেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবে বুঝি।

সারাটা দিন পদ্ম বারবার ঘাটে দৌড়ে গেছে। সামনে মাঠ, দক্ষিণের বাড়ির খাল ধরে সুধন্যদা ফিরবে। নৌকার কাঠে লগির শব্দ হয়। কোনো নৌকা দূরে দেখতে পেলেই সে দাঁড়িয়ে থাকে।

নৌকা চলে যায়। ঘাটে ভিড়ে না। সুধন্যদা দুপুরে এল না। বিকেলে মিলি এসেছিল, সে অনেকক্ষণ মিলির সঙ্গে বসেছিল ছাড়াবাড়িতে। ঘোড়াটার ঘাস খাওয়া দেখছিল। তার কিছু ভাল লাগছিল না। নীলদার চোখ, সহজ সরল স্বভাব পদ্মকে কেমন আশ্চর্য এক মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে। কেউ ওর কষ্টটা বুঝতে পারে না।

মিলি বলল, পদ্ম তোর নীলদা খুব বোকা।

পদ্ম বলল, সুধন্যদা এখনও এল না। কি যে হবে না!

—কেন কি হয়েছে?

—কি ঝড় গেল!

—সুধন্যদা আছে ভয় কি!

—নদীতে থাকলে।

—ও ঠিক এসে যাবে।

মিলি বলল, নীলদা এলে একদিন আমরা ঘোড়াটা নিয়ে আস্তানা সাবের দরগায় যাব।

—আমাকে নিবি না। পদ্ম কেমন মিনতি জানাল।

—নেব। নীলদাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাব।

—কোথায় যাবি।

—যেদিকে চোখ যায়।

পদ্ম বলল, নীলদা যাবে না।

—কেন?

—না যাবে না। নীলদাকে এলে বলব তুমি যাবে না। এবং এ ভাবে কেন যে মিলি তার প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। মিলির বাবা অষুধ ফিরি করতে গেছে। না হলে যেন সে গিয়ে বলত, কবিরাজ কাকা মিলি বলছে দাদাকে নিয়ে কোথায় চলে যাবে!

মিলি বলল, তোর নীলদা ভাল না। আমাকে কি সব বলে।

—নীলদা কি বলে তোকে!

—তোকে বলা যাবে না। খারাপ কথা। কত সহজে মিলি কথাটা বলে ফেলল। পদ্মের ভেতরটা কেমন হাহাকার করছে। খারাপ কথা কি হতে পারে পদ্মর বুঝতে কষ্ট হয় না। পদ্ম আর এক দণ্ড বসে নি। সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। নীলদা এমন একটা খারাপ কাজ করতে পারে ভেবে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে আর ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল না। সে ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে থাকল।

ফুলু মাসি অবেলায় শুয়ে থাকতে দেখে বলল, কিরে তোর শরীর খারাপ?

পদ্ম বলল, না।

—তবে শুয়ে আছিস কেন?

পদ্ম জবাব দিল না।

মা এসে বলল, কিরে পদ্ম, বলে কপালে হাত রাখল।

পদ্ম একটা কথা বলছে না। অপলক তাকিয়ে আছে জানালায়।

—তোর কি হয়েছে?

সে কিছু বলছে না।

—অবেলায় শুয়ে থাকতে নেই। ওঠ।

সে কোন সাড়া দিল না। বালিশে মুখ গুঁজে দিল।

মা কেমন ক্ষেপে গেল তার। —কি হয়েছে তোর? সে জানে মেয়েটার ভারি নিজের দুঃখ লুকিয়ে রাখার স্বভাব। হাত পা বাড়ন্ত। চুল এখন বিনুনি করে বাঁধলে বেশ বড় দেখায়। এ বয়সেতো মা মাসীদের তখনকার দিনে বিয়ে হয়ে যেত। মেয়েটার স্বভাব মিষ্টি বলে সে ক্ষেপে গিয়েও কিছু করতে পারে না। পাশে বসে বলল, কোথাও ব্যথাটেথা হচ্ছে। মেয়েরা এ-সময় ব্যথা-টেথা হলে লুকিয়ে যায়।

পদ্ম বালিশে তেমনি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। ওর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল।

—বলবি তো কি হয়েছে ?

—কিছু হয় নি।

—কেউ মেরেছে ?

—না।

ঝগড়া করেছিস কারো সঙ্গে ?

—না।

—মানু মেরেছে।

—না না।

—নীল তোর কিছু নিয়ে গেছে।

—না না না! বলে সে উঠে বসল। বলল, নীলদা মা আমার কি নিয়ে যাবে! তুমি কেবল কেন মা নীলদাকে এমন ভাবো। নীলদার তো কিছু চুরি করে নেবার স্বভাব না। বলে সে তার উদ্গত অশ্রু আর সামলাতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। আর তখনই মনে হল সুধন্য হাঁক পাড়ছে—সুধন্যদা এসে গেছে। পদ্ম প্রায় পাগলের মতো ছুটে ঘাটে চলে গেল। বলল, তোমাদের কিছু হয়নি তো সুধন্যদা।

—কি হবে! ঝড়ের সময় শিরিস মাঝির চালের গুদামে ছিলাম! কি মজা!

পদ্ম দেখল ঠাকুমা আসছে। ছোট-দাদু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্ম মনে মনে বলল, নীলদা তুমি ভাল না। ফিরে এলে কথা বলব না। তারপর পদ্ম কেমন গাছপালার নিবিড় সুষমার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা গেল না। নীলদা তার মতো পৃথিবীর সব কিছু রহস্য তবে ক্রমে জেনে ফেলছে।

॥ সাত ॥

হেমন্তকাল এসে গেল। অনল হেমন্তকালের মাঝামাঝি সময় ফিরে এল। বর্ষার জল আর মাঠে নেই। তবু বিলেন জমিতে কাদা জল, কাদাজল ভেঙ্গে ধানের মাঠ পার হয়ে অনল হেমন্তের মাঝামাঝি সময়ে একাই চলে এল। লাধুরচর পর্যন্ত সে এসেছিল সেকেন্দারের সঙ্গে। বাবা সেকেন্দারকে বলে দিয়েছে, গবিপবদির পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিবি। তারপর নীল তুমি আশা করি একাই যেতে পারবে। তুমি তো বড় হয়ে গেলে।

অনল ঠিক বুঝতে পারে না সে কতটা বড় হয়েছে। তবু মা যখন সাত-আট মাস পরে দেখলেন—একেবারে হাঁ। এবং ছেলের দিকে এভাবে তাকাতে ভাব বুঝি ভয় ছিল। চোখ লেগে যেতে পারে—কিসে কি হয় কে জানে। পাড়ার যমুনা পিসি বলেছিল—অমা, নীলতো তোমার বউ বড় হয়ে গেছে। নীল আয়নায় মুখ দেখেছিল। যেখানে যখন প্রথম দেখা হয়েছে গাঁয়ের কারো সঙ্গে, তুই নীল না। চিনতে পারা যায় না। নীল বুঝতে পেবেছিল, ওর প্যান্ট খাটো মাপের হয়ে যাচ্ছে। ছোট দাদু দুটো প্যান্ট দুটো জামা ফের বানিয়ে দিয়েছেন। আর শবীরের ভেতব সেই সব *দৃশ্যাবলি, সে অবাক হয়নি, তার তো ক্রমে জানা হয়ে গেছে কি* সব নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে। অবনী তাকে মাঝে মাঝে তালিম দিত। সে ভয় পেয়ে গেলেই বলত, অবনী আমার কি সব হয়। এবং মাঝে মাঝে মনে হতে থাকে তার, আসলে পদ্ম পাশাপাশি আছে বলে সে সহজে বড় হয়ে যেতে পারছে। পদ্ম কাছে না থাকলে সে আরও কিছুদিন ছোট থেকে যেতে পারত। এবং মা অথবা পাড়াপড়শিরা দেখে অবাক হত না' নীল না? চেনা যায় না। বাবা তাকে দিতে এবারও তবে সঙ্গে আসতেন।

পরীক্ষার সময় বলে সে আর বেশি ভাবতে পারে না। সে ফিরে এসে লক্ষ্যই করেনি পদ্ম আর তার সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলছে না। কেমন তাকে এড়িয়ে চলছে।

মানুদা তার ঘরে পড়ে। পদ্ম পড়ে বারান্দার তক্তপোষে। পদ্মর জন্য আসে গগন পণ্ডিত। পদ্মকে অঙ্ক ভূগোল শেখায়। মানুদা খুব গলা ছেড়ে পড়ে। ঠিক নিবারণদার হামানদিস্তার মতো তার গলার আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। ছোট দাদু রোজ আর বাজারে যেতে পারেন না। অসুখ-বিসুখ হলে নীল ঠাকুর ঘরের ভার পায়। ছোট দাদু দরজায় বসে থাকেন। সে সেদিন আর প্রায় পড়তেই পায় না। মানুদা মাছ না হলে খেতে পারে না। হেমন্তের সময়ে তাকে পূবপাড়ার বাজারে বেশ ছুটে যেতে হয়। বাজার আর ঠাকুর পূজো দুটো যেদিন থাকে সে আর একদণ্ড পড়তে পায় না। যেন ধীরে ধীরে সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। এবং সে পূজোর ঘরে বসে থাকলে বুঝতে পারে ছোট দাদুর চোখ ঘোলা ঘোলা, তিনি একে একে যেমন পঞ্চদেবতার পূজোর কথা বলেন, তেমনি গণেশের পূজোর সময় বলেন, ধ্যান করলে না—এবং মাঝে মাঝে সব কেমন ভুলে যান, অনল তখন নিজেই উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বলে যায়—ওম পাশাক্ষমালিকাম্ভুজ···এসব মন্ত্র সে ক্রমে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। ছোট দাদু কেমন তখন কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

এভাবে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখল, পদ্ম ছাড়াবাড়িতে একটা বড় টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্ম পরেছে ছিটের ফ্রক। পদ্ম হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর পদ্মর কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পদ্ম ওখানে কি করছে সে বুঝতে পারছে না।

সে একা, শীতের সময়। স্কুলের ছুটি কিছু আগে হয়েছে। শীতের দিনে স্কুল থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। সে বলল, যাই।

চারপাশে এখন যব গমের ক্ষেত। সে যব গমের ক্ষেতে নেমে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবার মতো খালপাড়ে উঠে ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম বলল, এখানে।

অনল ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে ঢুকে গেলে দেখল, পদ্ম ফ্রকের নিচ থেকে কি সব বের করছে। পদ্ম বলল, খাও।

পদ্ম নীলদাকে কতদিন কিছু খেতে দেয়নি। বাড়ির সব ভাল খাবার সবাই পায়। কেবল নীলদার জন্য অন্য নিয়ম সংসারে। পদ্মর রাগটা পড়েনি। এই শীতকাল পর্যন্ত সে রাগটা পুষে রেখেছিল। বাড়িতে পিঠে হতেই সে আর ঠিক থাকতে পারছে না। সে বলতেও পারছে না তুমি মিলিকে কি বলেছ নীলদা, যতবার ভেবেছে বলবে ততবার সে কেমন গুটিয়ে গেছে। এবং নীলদা ক্রমে কেমন আরও দূরে সরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যায় লণ্ঠন জ্বেলে নীলদার ঘরে রেখে এলে একটা কথাও প্রায় হত না। নীলদা এমনিতেই মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। সংসারে নীলদার ওপর ক্রমে যত অত্যাচার বেড়ে যেতে থাকল—পদ্ম কেবল বুঝতে পারে তত নীলদার হাত থেকে তার পড়ার সময় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ছোটদাদু কেমন সব জোর হারিয়ে ফেলছেন—তিনি আর আগের মতো মাকে কিছু বলতে সাহস পান না।

এতদূর যাওয়া আসার একটা ধকল থাকে। তবু নীলদাকে দেখলে বোঝাই যায় না ভেতরে খুব কষ্ট তার। সে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। খিদেয় চোখ-মুখ কাতর। তবু কেমন পদ্মর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। আর নীল দেখল চার-পাঁচটা পাটি-সাপটা কলাপাতায় জড়ানো। বাড়িতে তবে আজ পিঠে পায়েস হচ্ছে। ক্ষিরের পুলি ভেতরে। সে তাড়াতাড়ি খেতে খেতে বলল, কেউ দেখে ফেললে পদ্ম!

—কেউ দেখবে না। তুমি খাও তো।

প্রায় গব গব করে খেয়ে ফেলল নীল। ক্ষিদে কি পরিমাণ ওর

খাওয়া না দেখলে বোঝা যাবে না। তবু পদ্ম ভেবেছিল, নীলদা সবটা খাবে না। কিছু রেখে অন্তত বলবে, তুই খা পদ্ম। ওকে কিছুটা দেবে।

নীল বলল, যা সবটাই খেয়ে ফেললাম।

পদ্ম বলল, নীলদা মিলি তোমাকে বলেছে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে।

—মিলি এসেছে ?

—পূজোয় এসেছিল।

—মিলি কবে আবার আসবে ?

—জানি না। একটু থেমে পদ্ম কি ভাবল। তারপর সহসা মুখ ভার করে বড়দের মতো বলল—তুমি কিন্তু নীলদা যাবে না।

—কোথায় ?

—মিলির কাছে।

নীল বুঝতে পারছে পদ্মও তার মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। ওরা তখন ঝোপ জঙ্গলের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় বসে রয়েছে। চারপাশে এখন শীতের সূর্য, তার নরম আলো এবং কেমন এক-সময় নীল বলল শীত করছে রে পদ্ম। চল উঠি।

পদ্ম বলল, আর একটু বোস না।

—তোকে কেউ খুঁজে বেড়ালে কি হবে ?

—কেউ খুঁজবে না। তুমি বোস।

শীতকালের আকাশ ভারি হাল্কা। কবুতরের পাখার মতো নরম শীত নেমে আসছে পৃথিবীতে। মাথার ওপরে কত সব গাছপালা। দূরের মাঠ আকাশ সব দেখা যাচ্ছে। শেষ বেলার রোদ গাছের ডালে পাতায়। নীল উবু হয়ে বসে আছে। পদ্ম বলল, ভাল করে বোস না। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

পদ্ম কি চায় সে বুঝতে পারে না। ভেতরে একটা দুঃখ উঁকি মারে। লজ্জায় কেমন রাঙ্গা হয়ে ওঠে ওর মুখ। পদ্ম ফ্রক টেনে

বসেছে। তবু পা এবং উরুর অনেকটা দেখা যাচ্ছে। সাদা মোমের মতো পবিত্রতা ওর সারা শরীরে। পদ্মর চুলে ভারি মনোরম গন্ধ। চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। কপালে কিছুটা চুল উড়ে এসে পড়েছে। ফ্রকে নানারকম ফুল ফল আঁকা। এবং পদ্মর সারা শরীরে এক অদ্ভুত রহস্য। সে সেটা টের পেলেই কেমন ভয়ে আৎকে ওঠে—এই পদ্ম, আর কতক্ষণ বসে থাকব ?

—তুমি বসো নীলদা। তোমার ভাল লাগছে না !

—ভয় করছে যে।

—তুমি খুব ভীতু।

পদ্ম আর কথা বলে না। দু হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে। পদ্ম বোধ হয় তাকে কিছু বলতে চায়। এমন সুন্দর একটা আকাশ আর গাছপালার নিচে পদ্ম তাকে কি বলবে—এবং পদ্ম কিছু না বললে সেও কিছু করতে পারে না। ওর বুকের ভেতর কেমন করছে। শরীরে জ্বর জ্বর ভাব। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। সে পা ছড়িয়ে বসতে পারছে না। তবু এই নিরিবিলি ঝোপ জঙ্গলের ভেতর সে টের পায় পদ্মর ভেতর একটা গোপন দুঃখ আছে। তার গোপন দুঃখের সঙ্গে ওর দুঃখটার বোধ হয় ভারি একটা মিল। সে ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম মাথা তুলল না। শুধু বলল, হু।

—তোর কোনো কষ্ট হচ্ছে ?

পদ্ম কিছু বলল না।

পদ্মের সারা শরীর কাঁপছে।

—এই পদ্ম কিছু বলবি তো।

পদ্ম বলল, নীলদা তুমি ভাল না।

নীল বলল, আমিতো কিছু করিনি পদ্ম।

—মিলিকে তুমি কি বলেছ ?

—মিলিকে কিছু তো বলিনি।

—কিছু বলনি ?

—না।

—এই কিছু খারাপ কথা।

নীল মনে করার চেষ্টা করল। ওকে আমি খারাপ কথা বলব কেন ?

—মিলি যে বলল।

—কি বলেছে ?

—বলেছে, তুমি ওকে কি খারাপ কথা বলেছ।

—পদ্ম তোকে ছুঁয়ে বলছি, ওকে কোনো খারাপ কথা বলিনি।

—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

নীল বলল, পদ্ম কথা বললে কি হবে ?

—ও ভাল মেয়ে না। ও অনেক কিছু জানে।

—ও কি জানে ?

—ও যা জানে, তুমি এখনও তা জান না।

নীল দেখল দূরে তখন নীল আকাশ আর নীল থাকছে না, আকাশ লাল হয়ে উঠছে। গাছ পাতার ফাঁকে পৃথিবীর এই সময়টুকু দুজনকে কেমন রঙ্গীন ছবির মতো করে রেখেছে। পদ্ম কিছুতেই নীলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

সে ডাকল, এই পদ্ম চল এবারে উঠি।

—আমাকে তোমার ভাল লাগে না, না নীলদা ?

—আমি তা বলেছি।

—তবে উঠি উঠি করছ কেন ?

—কতক্ষণ বসে থাকব !

—ঠিক জানি না নীলদা, তুমি পাশে বসে থাকলে আমার খুব ভাল লাগে।

—আমারও।

—সত্যি বলছ !

নীল বলল, সত্যি। সত্যি ভাল লাগে পদ্ম। একটুকু বানিয়ে বলছি না। সে তার বই খাতা আবার হাতে তুলে নিল। আর বসে থাকা ঠিক না। পদ্মর ভারি সাহস। সে প্রায় এ-শীতেও ভয়ে কেমন ঘেমে উঠছে।

পদ্ম বলল, যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও।

নীল সহসা কি ভেবে বলে ফেলল, যাব।

এবং এ-ভাবে নীলকে এই কোথাও কেউ এখন নিয়ে যেতে চায়। সেও যেতে চায় কোথাও—সেটা কতদূরে, সেটা কি ভাবে, কোন এক রহস্যময় পৃথিবীতে সে সঠিক কিছু জানে না। যখন পদ্ম অথবা মিলি থাকে পাশে, এক অপার আনন্দ এই সব ঘাসে ফুলে অথবা সবুজ বনভূমিতে খেলা করে বেড়াতে থাকে। কেবলই মনে হয় কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে সেখানে, বলবে নীল, তুমি স্বপ্ন ভ্যাখোনা?

হ্যাঁ দেখি।

আমাকে ভ্যাখো না।

দেখি।

আর কি ভ্যাখো!

আরো কি সব যে দেখে ফেলি পদ্ম।

বলনা কি ভ্যাখো?

যা! বলা যায় বুঝি!

বলনা, কাউকে বলব না।

আমি যে কি সব দেখি পদ্ম!

সবাই দেখে।

তুইও দেখিস পদ্ম?

না দেখলে বড় হব কি করে?

দেখলে বুঝি বড় হওয়া যায়!

দেখলে সুন্দর হওয়া যায়। নিজেকে ভারি ভালবাসতে ইচ্ছে করে নীলদা। সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে ইচ্ছে করে। আমার যা কিছু আছে সব পুষ্ট হয়ে যায়। ফুটে উঠতে চায়। স্বপ্নে আমাব কেবল ফুটে উঠতে ইচ্ছে করে।

কে জানে পৃথিবীতে এরই নাম বড় হওয়া কিনা। সে কখনও একা একা থাকলে পড়তে পড়তে কোথায় যে কখন ভেসে যায়, সে দেখতে পায় কেউ ফুটে উঠছে, সে দেখতে পায় ধরণী শান্ত, আকাশ নীল, জলপ্রপাতের শব্দ অবিরাম, তার সব কিছু সেই বড় হওয়ার জন্যে। সে যে কি পড়ছে মনে করতে পারে না তখন। দেখতে পায় বিনুনি বেঁধে একটা মেয়ে ফ্রক গায়ে দিয়ে কেবল মাঠেব ওপর দৌড়াচ্ছে। সে ছুটছে তাব পিছু পিছু। কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না। কেবল কোথায় যে সে নিয়ে যেতে চায় তাকে।

এবারে পদ্ম বলল, নীলুদা চল ওঠি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নীল বলল, তুই যা।

—আমার সঙ্গে এস। আব বসে থাকতে হবে না।

—তুই যা না।

নীল আসলে এই ভর সন্ধ্যায় পদ্মব সঙ্গে ঝোপ জঙ্গল থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। কোথায় যে একটা ভারি অপরাধ বোধ, কেউ যদি দেখে ফেলে, এবং কেন যে ভেতরে এমন একটা সংশয়—সে বুঝতে পারে না, কেবল মনে হয় ফুলু মাসি কোনো ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে, একদিন ফুলুমাসি বলেছিল, তুমি খুব পাজি হয়ে যাচ্ছ। নচ্ছার ছেলে। বড়বাবু এলে সব বলে দেব।

এবং সেদিনই সে ফিরলে দেখেছিল ফুলুমাসি বাড়ি মাথায় করে চেচাচ্ছে।

পদ্ম চুপিচুপি ঘরে ঢুকতেই কে পেছন থেকে চুল টেনে ধরল। আবছা অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ঠিক দাদা। সে বলল, দাদা ছাড় বলছি।

মানু বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—কেন মিলিদের বাড়ি।

—ছিলে না।

—সত্যি ছিলাম।

—আবার মিথ্যে কথা।

—ছিলামই তো।

—দেব ঠাস করে চড় বসিয়ে। বলেই চুল ধরে ঝাকাতে লাগলে আজ এই প্রথম পদ্ম কাঁদতে পারল না। সে অন্য সময় হলে পাড়া মাথায় করে চেঁচাত। কিন্তু ভারি আশ্চর্য এতটুকু তার কান্না আসছে না। সে ইচ্ছে করলে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে। দাদাকে জব্দ করার এর চেয়ে বড় অষুধ আর জানা নেই। কাঁদলেই মা তেড়ে আসবে কোথাও থেকে। আর দাদার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে। যত রাগ দুঃখ অথবা অভিমান সংসারে, দাদাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে না পারলে মার আক্রোশ কমেনা। কোনো একটা ছল চুতো চাই।

পদ্ম বলল, দাদা চুল ছাড়।

—না ছাড়ব না।

—তোর রাবণ রাজার অবস্থা হবে।

—কি বললি!

—তুই রাবণ রাজার মতো ধ্বংস হবি।

মানু চুল ছেড়ে বলল, পাকা পাকা কথা!

—জানিস মেয়েদের চুল ধরে টানতে নেই।

—একেবারে পাকা বুড়ি।

ফুলুপিসির দুপুর থেকেই মাথা বিগড়ে আছে। বিয়ে না হলে এমন হয়। পদ্ম দাদার সঙ্গে কথা বলার সময় পিসির গালমন্দ শুনতে শুনতে ফিক করে হেসে দিয়েছিল। পিসির কাছে সংসারে সবাই মন্দ মানুষ। বাবা, দাদু, ঠাকুমা এবং মা। আর নীলদা বুঝি এক নম্বরের শত্রু। বিয়েতে দুটো পয়সা খরচ করলেই বর পাওয়া

যায়। নীলদা এসে দাত্থর কিছু পয়সা নষ্ট করছে। নীলদাব জন্য পিসির বিয়েটা বুঝি আরও দেরি হয়ে গেল। একটা বাড়তি বোঝা সংসারে।

মান্নু তখন বলল, এতক্ষণ কোথায় তবে ছিলে ?

—বললাম তো মিলিদের বাড়ি।

—মিলিকে ডেকে আনব ?

—আনো না।

পদ্ম খুব সাহস দেখাচ্ছে। পদ্ম বলল, চুল ছেড়ে দে না দাদা। লাগছে।

তখনই মা হ্যারিকেন হাতে ঘরে ঢুকে বলল, এই যে স্নুবচনী, সারা বিকেল টো টো করে বেড়িয়েছ। এবারে মা একটু পড়তে বোস।

মাব আদরের কথাবার্তায় টান থাকলে, পদ্ম খুব ভালমানুষ হয়ে যায়।—মা ঠাকুব ঘরে ধূপধূনো দিয়ে আসব।

—যাও, কাপড় ছেড়ে যাবে।

মান্নু বলল, এক্ষুণি এল মা পদ্ম।

পদ্ম বলল, না মা, কখন এসেছি !

—কি মিথ্যে বলছে !

মা কাছে থাকায় পদ্ম কেমন সাহস পেয়ে গেল। বলল, মিথ্যে বলছিতো বেশ করেছি। এখন পদ্ম ঠিক আগের পদ্ম। মার কাছে তার ছাড়পত্র মিলে গেলে, পৃথিবীতে পদ্ম আর কাউকে ভয় করে না। সে বলল, দাদা পড়তে বোস। পিসি কিন্তু খুব বিগড়ে গেছে।

মান্নু বলল, নীলের কপালে আছে !

পদ্মর মুখটা সহসা ভারি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, কি আছে দাদা ?

—পিসির শাড়িটা ছিড়েছে। বিশে গরুটা পিসিকে ফেলে দিয়েছিল।

—নীলদার কি দোষ।

মানু বলল, জানি না। বিকেল থেকে সাসাচ্ছে। আসুক, আসুক আজকে। ঘাটে বড় জামবাটি পড়ে গেছে। পাওয়া যাচ্ছে না।

পদ্ম বলল, নীলদা কি করবে?

পিসি চিৎকার করছিল, আর কেউ স্কুল করে না। একেবারে নবাব বাদশার স্কুল। আমরা পড়িনি।

পদ্ম ধূপধূনো দিতে যাচ্ছিল। পিসির কথা শুনে আবার হেসে ফেলল। পিসির ক্লাস টু বিদ্যে। অনেক ক'বছরে পিসি ক্লাস টু বিদ্যে শেষ করেছিল—সেই পিসি পড়ার নামে পাড়া মাথায় করছে।

দাত্নু বাড়ি নেই। পেরি ঘোষের বাড়িতে পাশা খেলতে গেছে। পেরি ঘোষের চাকর একটু রাত হলে লণ্ঠন হাতে দাত্নুর সঙ্গে আসবে। দাত্নু বাড়ি না থাকলে পিসির সাহস বেজায় বেড়ে যায়। এবং এ-সময় নীলদা যে কোথায়! এখনও আসছে না কেন। সুধন্যদা বাড়ি থাকলেও এত বাড় বাড়তে পারত না পিসি।

ধূপধূনো দিতে গিয়ে মনে হল পদ্মর, পাতাবাহার গাছটার আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে এ-ভাবে কেউ আর বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে থাকে না। কি ভয় তার জন্য অপেক্ষা করছে—এবং কে কি-ভাবে তাকে নেবে--নীলদা ছাড়া পৃথিবীতে এ-দুঃখটা কেউ টের পায় না। সে কাছে গিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন! যাও। ভিতরে যাও।

—মাসি চিৎকার করছে কেনরে পদ্ম।

—বিশে গুতো মেরেছে। শাড়ী ছিঁড়েছে। ঘাটে বাসন ধুতে গিয়ে বড় জাম-বাটি জলে পড়ে গেছে।

সব ভয় টয় মুহূর্তে কেটে গেলে নীল বলল, তোকে কিছু বলেছে!

—কি বলবে!

—কেউ কিছু!

—না তো! তারপর সহসা কি মনে পড়ার মতো বলল, অ দাদা বলেছে। দাদা যাই বলুক, কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না। দাদার নিজের হাজাররকমের ফুটো। সে কিছু বললে, সহজেই ফটিয়ে দেওয়া যায়।

—কি বলেছে?

—বলেছে কোথায় ছিলি? বললাম, কোথায় আবার, মিলিদের বাড়িতে। তাবপর পদ্ম কেমন ফিস ফিস গলায় বলল, যাও। আর দেরি কর না।

নীল কেমন এবার ব্যাজার মুখে বলল, পদ্ম তুই আমাকে আর এ-ভাবে কোথাও ডেকে নিয়ে যাস না। সত্যি খুব ভয় করে আমার।

বড়দিনের ছুটিতে মিলি এল। ডলি কমাস হল এখানেই আছে। মান্নুদা বিকেল হলেই পাটকবা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বের হয়। কাছারিবাড়িতে ফুটবল নেমেছে। বল নিয়ে যখন অবনী কান্নু কান্তি দৌড়ে বেড়ায়, নীলু যখন ব্যাকে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মান্নুদা নিমের ডালে দাঁত ঘসে। দাঁতগুলো মান্নুদার এমনিতেই সুন্দর। ঝকঝকে। সারাক্ষণ এভাবে মান্নুদার অভ্যাস ফাঁক পেলেই দাঁত মাজা। কখনও সে মান্নুদাকে খেলার মাঠে দেখতে পায় না। একটা বই হাতে থাকে। ঘোড়াটা যেখানে ঘাস খায় তার থেকে একটু দূরে আলাদা গাছের ছায়ায় বসে থাকে। শীতকাল বলে গরম চাদর গায়। এবং সব সময় কেমন মান্নুদার চোখ নীল রঙের ডাকবাকস পার হয়ে আরও দূরে—করবী গাছটার নিচে। সেখানে মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে মান্নুদার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হয় তখন। মান্নুদাকে ভারি দুঃখী মানুষ মনে হয় তার।

কবিরাজ বাড়ির পাশ দিয়ে কতবার যে মান্নুদা হাঁটতে হাঁটতে আস্তানা সাবের দরগার দিকে চলে যায়। বিকেল হলেই এমনটা হয়। মান্নুদা আর ঘরে থাকতে পারে না। মনে মনে ডলির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। ডলির সুন্দর ছাপা শাড়ি সে দেখতে পায় কখনও গাছের ফাঁকে। অথবা চন্দন গোটা তোলার সময় ডলি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে বুঝি ভালবাসে। সংগোপনে কিছু একটা মান্নুদা আর ডলির মধ্যে হচ্ছে সে টের পেলে বলে, দাও চিঠিটা। আমি দিয়ে আসব।

—কে রে?

—আমি নীল মামীমা।

—কি খবর। পড়াশোনা করছিস তো ঠিক মতো।

বাড়িটা ইটের। মেজেন্টা রঙে ছোপানো। নীল রঙের জানালা দরজা। ভেতরে সাদা রং ধবধবে—পালিশ করা খাট চেয়ার। সামনে খোলা শানবাঁধানো বারান্দা। বেতের চেয়ার। ফুল ফল আঁকা টেবিলের ঢাকনা। একেবারে ছিমছাম—ঘরের ভেতরে হরিণের শিং মোষের মাথা ঝোলানো। সামনে ঘাসের লন। উত্তুরে হাওয়া পড়ে গেলেই ডলি মিলি নেট ঝুলিয়ে দেবে। ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট হাতে ওরা ঘাসের ওপর ছুটবে। ডলির ফাঁপানো চুল তখন মুখে এসে পড়লে মনে হয় মেয়েটা ভীষণ ছুটতে ভালবাসে। ওদের পায়ে সাদা মোজা, সাদা কেডস। হলুদ রঙের কাঁচের চুড়ি ঝমঝম করে বাজে। আর হাল্কা কর্কটা বাতাসে ভেসে থাকলে দু বোনকেই মনে হয় ভিন্ন গ্রহের মানুষ তারা।

সে বলল, ডলিদি কোথায়?

—ডলি ডলি। ঘরের ভেতর থেকেই হাঁক আসে। কবিরাজ-দার দুটো একটা কাশির শব্দ, তিনি বোধ হয় ডিসপেনসারিতে যাচ্ছেন। তার বুক কাঁপে তখন।

ডলি তখন পেছনে এসে দাঁড়ায়। চারপাশে সন্তর্পণে তাকিয়ে

চুপি চুপি বলে, দে। তারপর কেমন সেই সুন্দর মেয়েটা নিমেষে হারিয়ে যাবার আগে একটা চিঠি ওর হাতে গুঁজে বলে, সাবধান দেখিস যেন কেউ না দেখে।

এত বিশ্বাসী সে যে ওরা কেউ এ নিয়ে আর ভাবে না। ওরা জানে বোধ হয় নীল পৃথিবীর খবর তখনও ঠিক ঠিক পায়নি। নীলের লম্বা শরীর। এবং পবিত্রতা শরীরে এখনও লেগে আছে। নীল দৌড়ে চলে গেলেই মিলি ডাকে—এই নীলদা কোথায় যাচ্ছ, আমি জানি তোমার হাতে কি ওটা!

নীল একদণ্ড আর দাঁড়ায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে আঁটা খাম মামুদার হাতে দিয়ে বলে, নাও। মিলি টের পেয়ে গেছে।

—কি টের পেয়েছে!

—ডলিদি তোমাকে চিঠি দেয়!

—ও জানবে কি করে!

—আমাকে যে বলল হাতে কি আছে জানি।

—ধুস। এমনিতেই বলেছে। মেয়েটা বড্ড পাকা। গেছো মেয়ে।

তখন মিলি দূর থেকে ডাকে। —নীলদা যাবে?

—কোথায়।

—এই কোথাও।

ওরা যে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়—এবং সব সময়েই যেন পদ্ম অথবা মিলি তাকে ডাকে—এই নীলদা যাবে?

—কোথায়?

এই কোথাও।

পদ্মও ডাকে—নীলদা যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও।

কখনও সে পদ্মকে বলত, পদ্ম আমার ভয় করে।

কখনও সে মিলিকে বলত, মিলি আমার ভয় করে।

পদ্ম বলত, ভয়ের কি আমি তো তোমার পাশে থাকব।

মিলি বলত, ভয়ের কি আমি তো আছি।

আর মিলি এমনিভাবে একদিন ঠিক ওকে ধরে নিয়ে গেল আস্তানা সাবের দরগায়। ঘোড়টার দড়ি খুলে দিল। সে নীলকে নিয়ে পালিয়ে আস্তানা সাবেব দরগায় চলে যাচ্ছে। না গেলে যদি মিলি বলে দেয়—নীলদা ডাক হরকরার কাজ নিয়েছে। দিদির চিঠি পৌঁছে দেয়। সবাই জেনে ফেললে মানুদা ঠিক লজ্জায় আত্মহত্যাকরবে। সে কিছুতেই বলতে পারল না, না মিলি আমি যাব না। পদ্ম রাগ করবে।

বসন্তকাল বলেই চারপাশে আবার পাতা সব ঝরছে। আগে মিলি, মাঝে ঘোড়া, আর বেশ পেছনে নীল। বিকেলের দিকে ঘোড়াটা এমনিতেই মিলির কথা বেশি শোনে। বিকেল হলেই মিলির স্বভাব ওর সামনের দু পা থেকে দড়ি খুলে দেবার। বাবা এজন্য ওকে আগে বকাঝকা কবতেন। এখন করেন না। বাবা নিজেই অবাক হয়ে দেখেন, আলো—মিলির ভারি আজ্ঞাবহ দাস। কবে যে মেয়েটা কিভাবে আলোকে নিজের করে ফেলেছে কেউ জানে না। যেমন করিম চকিদার ওর মার, তেমনি সে আলোর। আলো বিকেল হলেই আর ঘাস খায় না। লাল ইঁটের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিলি এসে তার পা থেকে দড়ি খুলে দেবে। এবং দিলেই লেজ নেড়ে কদম দেবে, দৌড়ে যাবে কিছুটা, গাছেব ছায়ায় ঘুরে বেড়াবে। আর যখন ডাকে মিলি, চল ঘাস খাবি, ভারি বিনীত স্বভাব হয়ে যায় ঘোড়াটার। কদম দিতে দিতে চলে আসে। সামনে সটান দাঁড়িয়ে একেবারে মাটির ঘোড়া হয়ে যায়। আর মিলি হাঁটতে থাকলে পিছু পিছু হেঁটে যাবে। মিলি দাঁড়ালে নুয়ে ঘাস খাবে। মিলি বসলে, চারপাশে কখনও লেজ তুলে কখন দুলকি চালে নাচবে, যেন ঘোড়াটার যাবতীয় খেলা, এই যেমন দু

পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা, পা ভাঁজ করে শিকারী বেড়ালের মতো ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দেওয়া এবং কখনও দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে মিলি, সাদা সাটিনের ফ্রক, চুল উড়ছে, কেশর চেপে মেয়েটা মাঠের শূন্যতায় ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

যেন বিকেলে ঘাস খাওয়াতে যায় মিলি, ঘোড়া নিয়ে সে একা যায়, কখনও করিম মিঞা থাকে, কখনও থাকে না। গ্রামের শেষে সেই বড় ফকিরের দরগা, প্রায় যেন ক্রোশ খানেক তার বিস্তার—এবং কত যে গাছপালা তার ভেতরে। কেউ একা কখনও ঢোকে না। দূর থেকে আসে সব মানুষেরা। মেলার দিনে, দরগায় জিলিপি ভাজা হয়। এবং বাকি সময়টা দরগা থাকে তার দুই সানবাঁধানো বেদী নিয়ে। ওপরে সব বড় বড় রসুন গোটার গাছ আর নিচে সব পাতার জঞ্জাল। তার চারপাশে থাকে ছোট ছোট নরম ঘাস। ঘোড়াটা সেই সব ঘাস খেতে ভারি ভালবাসে।

কিছু ডোবা খানাখন্দ পার হয়ে গেল মিলি। ঘোড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল। কেউ দেখল সেই কবিরাজ বাড়ির মেয়ে মিলি. চুলে লাল রিবন বাঁধা, পায়ে সাদা কেডস্ জুতো, সাদা মোজা, হলুদ ফ্রক গায়ে, এবং লম্বা মতো মেয়ে প্রায় দু-হাত মেলে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। আসলে ঘোড়ার পিঠে মেয়েটা চলে যাচ্ছে। আগে হৃদয়, বলরাম, রসো, মিলিকে দেখলেই ঘোড়াটার পিছু পিছু ছুটত। এখন মিলি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে তারা আর সাহস পায় না। শুধু নীল জানে মিলি ঘোড়াটাকে নিয়ে কোথায় যাবে। কোথায় গিয়ে মিলি আর আলো ওর জন্য অপেক্ষা করবে।

সেও যাচ্ছে পালিয়ে। সেতো জানে না, পদ্ম দেখছে, ওদের ঠাকুর ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে পদ্ম—দত্তদের আমবাগান পার হয়ে নীলদা বিকেলে কোথায় যাচ্ছে! নীলদা হাঁটতে হাঁটতে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। পদ্ম এবার সোজা দৌড়ে অর্জুন গাছটার নিচে চলে এল। দেখল, মিলি আর ঘোড়াটা চোখের ওপর থেকে

অদৃশ্য। নীলদাকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় নিমেষে ওরা উবে গেল। পদ্মর অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছে। নীলদাকে নিয়ে মিলি কোথায় পালিয়ে গেল!

—এই মিলি। তখন নীল মিলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—এখানে।

—দেখতে পাচ্ছি না।

—উঠে এস না।

নীল দ্রুতবেগে উঠে গেল। সব গাছপালা উচু টিলার ওপর। টিলার ওপাশে নেমে গেছে আবও সব গাছপালা। হিজল, পিটকিলা, বড় বড় সব অর্জুন গাছ এবং রসুন গোটার গাছ। এ-সব পার হয়ে গেলে, নিচে ছোট জলাভূমি। দূরে চাষ আবাদের সব জমি। গ্রীষ্মের উত্তাপে সব খাঁ খাঁ করছে।

নীল টিলার ওপরে উঠে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এমন লতাগুল্মে ঢাকা যে মনেই হয় না, কোথায় কেউ এই অসময়ে থাকতে পারে। সে ডাকল, মিলি!

হঠাৎ মিলি চেঁচিয়ে উঠল, তুমি এদিকে এস না নীল দা।

—কেন!

—আমি জলে নেমেছি।

পাশেই সেই সুন্দর জলাভূমি। চারপাশে সব হিজলের গাছ। চৈত্র বৈশাখের খর রোদে এমন ঠাণ্ডা জল দেখলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। বেশ বড় দীঘির মতো। আস্তানা সাবের দীঘিতে কিছু লাল শাপলা। তার পাতা পদ্ম পাতার মতো বড় বড়। সবুজ সবুজ জলজ ঘাস, এবং জল নেমে গেছে নিচে, সেই জলে গলা উচিয়ে রেখেছে মিলি। আর ঘোড়াটা পাড়ে দাঁড়িয়ে। অবেলায় ফ্রক প্যাণ্ট ভেজালে মিলির মা বকবে—মিলির এমন সাহসে সে ঘাবড়ে গেল। আর তখনই সে বুঝতে পারল, আসলে মিলি একেবারে উলঙ্গ। মিলি ফ্রক প্যাণ্ট ছেড়ে রেখেছে। ঘোড়াটা পাড়ে দাঁড়িয়ে

আছে সেই কাঠের ঘোড়ার মতো। ঘোড়ার পিঠে মিলির ফ্রক প্যান্ট। এমন একটা ঘোড়া আছে বলেই যেন মিলি সহজেই জলে নেমে যেতে পারে।

নীল বলল, চলে যাচ্ছিরে!

—ঘোড়ায় চড়বে যে বললে।

—তুইতো বললি, তুইতো আমাকে ডেকে নিয়ে এলি।

—ডলিদির চিঠিতে কি লেখা থাকে!

সে ভেবেছিল চলে যাবে। মিলিকে পাত্তা দেবে না। মিলির এমন একা একা জলে নেমে যাওয়া সে পছন্দ করছে না। আর এটা ঠিক না। যদি কোথাও কেউ দেখে ফেলে, মিলির কিছু হবে না, ওর অনেক কিছু হবে। ফুলু মাসি চিৎকার চেঁচামেচি করবে—'বয়ে হচ্ছে না বলে ফুলুমাসি তাকে যা খুশি তাই বলবে—পদ্মও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর যদি পদ্ম দেখে ফেলে! পদ্মতো ছুটির দিনে, সারা বিকেল কেবল নীলদা নীলদা করবে। পদ্ম ঘুমিয়েছিল, এমন গরমের দুপুরে সে ভেবেছিল সবাই ঘুমিয়েছে। কি জানি পদ্মতো জেগেও থাকতে পারে। যতই সন্তর্পণে সে আসুক না, পদ্ম টের পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু মিলি ভারি ধূর্ত। ভয় দেখাচ্ছে, চিঠিতে কি লেখা থাকে! নীল কিছু বলতে পারছে না। বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বলে মিলি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে সব দেখতে পাচ্ছে। মিলি যেন এখন কোনো অদৃশ্য মানুষের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। নীলদা তোমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না?

—কাকে?

—আমাকে।

—তোকে চিঠি লিখব কেন?

—ডলিদি চিঠি লেখে কেন?

—কবে লিখেছে?

—তুমি বুঝি জান না। বলেই মিলি জল কুলকুচা করছে। ওর বব করা চুল। এবং জনহীন এই প্রান্তরে খাঁ খাঁ রৌদ্দুরের ভেতর ঠাণ্ডা জলে তখন সাঁতার কাটছে। কোনো কিছুতে যেন মিলির আসে যায় না। এমন সুন্দর সরোবর দেখলে মানুষ সাঁতার না কেটে থাকে কি করে! মিলিকে এখন সোনালী মাছের মতো দেখতে লাগছে।

নীল জলের ভেতর মিলির সব দেখতে পাচ্ছে। ওর আর এখন যেতে ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগছে। আর ভয় ভেতরে তার, তবু সে নড়তে পারে না। এমনভাবে মিলি তাকে কেন যে আটকে রেখেছে। ভয় দেখাচ্ছে, চলে গেলে বলে দেব। মানুদাকে ডলিদি চিঠি দেয়। ডাকহরকরার কাজটা সে যেহেতু করে থাকে এবং ফুলু মাসির মুখ মনে হলেই সে ঘাবড়ে যায়—বড়বাবু আপনার শ্রীমান এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে না ডাকপিওনের কাজ করতে এসেছে। যেন ডলিদি কিংবা মানুদা তার মতো একটা বিশ্বস্ত ডাকপিওন না পেলে এমন একটা ভয়াবহ দুঃসাহসে মেতে উঠত না। সব দোষ যেহেতু সে বুঝতে পারছে তার—তখন মিলির সামান্য করুণা ছাড়া তার রক্ষে নেই। সে বলল, মিলি তুই আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?

মিলি সাঁতার কাটছিল। সাঁতার কাটলে জলে শব্দ হয়। মিলি বোধ হয় ওর কথা শুনতে পায়নি। সোনালী সাপের মতো তেমনি একেবেঁকে জল কেটে মিলি যাচ্ছে, সরোবরের ঠিক মাঝখানে আবার ডুব দিয়ে জলে অন্তর্হিত হচ্ছে. কখনও চিৎসাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। নীল আরও জোরে ডাকল, মিলি! চিৎ সাঁতার কাটলে মিলির সবই ভেসে উঠছে। ভয়ে কেমন পালাবে ভাবছিল, তখনও মিলি ডাকল, নীলদা, তুমি আমাকে সত্যি চিঠি লিখবে না? নীল রাগে দুঃখে বলল, না। না। না।

মিলি এবার পাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, জলে নামতে ইচ্ছে করে না।

—আমার ভয় করছে। কেউ আসতে পারে। মিলি তুই কাউকে বলবিনাতো!

— কাউকে বলব না।

— মিলি!

—কিচ্ছু হবে না।

মিলির এত সাহস ভাল না। মিলি কি টের পেয়েছে, পদ্ম তাকে বলেছে, নীলদা মিলি ভাল না। সে অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে তুমি মিশবে না। মিলি কি দেখাতে চায়, ছাখ পদ্ম, তোর নীলদা আমার কথা শোনে। আমি যা বলব তাই করবে। দেখবি! মনে হতেই নীল দেখতে পেল মিলি সোজা উঠে এসেছে। সে লজ্জায় চোখ বুজে ফেলল। তারপর যখন চোখ মেলে তাকাল, দেখতে পেল, মিলি ঘোড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে চুল মুছছে। ডাকছে, ও নীলদা এস। কোথায় তুমি।

নীল বলল, আসব?

—এস।

নীল নেমে যেতে যেতে দেখল, মিলি ঘোড়াটার ওপাশে। ওর খালি পা দেখা যাচ্ছে। মিলির বুকে সামান্য বাদামী আভা, এবং মিলি ফ্রক দিয়ে বুক ঢেকে রেখেছে। নুয়ে খালি পায়ে, যেন কত উদাসীন সে এইসব পোশাক সম্পর্কে, চারপাশে সন্তর্পণে নজর রেখে বেশ শেয়ানা মেয়ে যখন বলছে, ওঠো, চেপে বসো। তখন নীল বোকার মতো বলল, পড়ে যাব মিলি।

— পড়বে না বলছি। বলে সে ফ্রকটা এবার শরীরে গলিয়ে দিল। তারপর ঘোড়ার পিঠে হাত রাখতে কেমন সেই যে কাঠের ঘোড়া অথবা মনে হচ্ছিল নীলের ট্রয় নগরীর ঘোড়া এবং মিলিকে কেন জানি প্রায় হেলেনের মতো মনে হচ্ছিল। মিলির সাটিনের ফ্রক, বাদামী চুল গায়ের সোনালী রঙ, আর মিলির সুন্দর উরুর ভাজে সব কিছু এমন মনোরম যে নীল আর একটা কথা বলতে পারল না।

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলে মিলি এবার লাগামে হাত রাখল। মিলি আগে। সে পেছনে। মিলি খর রোদ্দুরে নীলকে পিঠে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম আল্গা করে দিতেই দিগন্তে সেই যে লেনা মানুষের থাকে এক স্বপ্নের রাজপুত্র অথবা স্বপ্নের রাজকন্যা, ওরা দিগন্তে সেই স্বপ্নের রাজপুত্র, রাজকন্যা হয়ে উড়ে যেতে থাকল।

॥ নয় ॥

সারা দুপুর কাটফাটা রোদ্দুর। কি তাপ রোদের। গাঁয়ে তখন একটা মানুষ দেখা যায় না। দরজা জানালা বন্ধ করে রোদের তাপ বিনষ্ট করছে। মাঠে ঘাস পাতা কিছু নেই। কেবল সারাটা দুপুর খাঁ খাঁ রোদ্দুরে গাছপাতা পাখপাখালি পুড়ছে। একটু বেলা পড়তেই বিলের জল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছিল। মানুষ জন আড়মোড়া ভেঙ্গেছে। দরজা জানালা খুলে দেখছে, বাইরে বের হওয়া যাবে কিনা ঠিক সেই সময়ে নিরবিলি গোপনে মিলি নীলদাকে নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

পদ্ম হেঁটে গেল কিছুটা। কেউ জানে না, সেও সময় বুঝে এই সব গাছপালা ছায়ার ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা ফুলু পিসি ঠাকুমা দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। সে বড়ঘরে তক্তপোষে শুয়ে ছবি আঁকছিল। দুপুরে অলস গরমে ওর কেন জানি ঘুম আসে না। ছোটদাদু তার ঘরে, সুধন্য বাড়ি নেই। দেশে গেছে। দাদা দুপুরে খেয়েই ঘরে থাকে না। মার কথা একেবারেই শোনে না। মাও আজকাল দাদাকে কেমন আগের মতো ছোট দেখে না। গলার আওয়াজ দাদার একেবারে বদলে গেছে। ঠিক বাবার মতো অথবা পুরুষ মনুষের মতো হেঁড়ে গলা—এবং আজকাল পদ্ম দেখেছে বরং দাদাকেই একমাত্র মা ভয় পেতে শুরু করেছে। সে কি করছে না করছে এ-বয়সে আর তার কেউ দেখার নেই। দাদা বিকেলে

আসবে না। কখনও বেশ রাত করে ফেরে দাদা। মা তখন কেমন খুব ভাল মানুষ হয়ে যায়। হ্যাঁরে মান্টু সন্ধ্যা হয় না। পড়াশোনা তা হলে আর করবি না। তারপর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে—কি যে পোড়াকপাল তার বাবাকে নানারকম দোষারোপ। তারপর মার হাতে এখন একমাত্র অস্ত্র, তোর বাবাকে চিঠি লিখছি, এখানে থেকে মান্টুটা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। এবারে তুমি আমাদের নিয়ে যাও। পদ্মার বুকটা তখনই কেমন ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। যদি সত্যি বাবা আবার তাদের কলকাতায় নিয়ে যায়, তবে নীলদাকে সে জন্মের মতো হারিয়ে ফেলবে। মিলি নীলদাকে নিয়ে তখন সব মজা লুটবে।

পদ্ম হেঁটে, কখনও দৌড়ে ঝোপজঙ্গল, মাঠ এবং গাছপালা পার হয়ে যাচ্ছে। জোরে ডাকতে পারছে না, তবে সব গাঁয়ের মানুষেরা জেগে যাবে। অবেলায় ফ্রক পরা সোমত্ত মেয়েটা যে কোথায় যাচ্ছে! সে চুপি চুপি প্রায় কখনও হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। লোকজন পথে দেখা হলেই বলবে, অমা পদ্ম দিদি যে। কোথায় যাচ্ছেন। আর এখন শাকপাতা তোলারও সময় নয়। খুব সকালে সে যে একা এদিকটায় কখনও না এসেছে তা নয়, ঠাকুমার জন্য সে একা গিমা শাক তুলতে এসেছে কখনও। এই সব ছোট বড় জলা-শয়ের পাশে সবুজ সব আভা ঘাসের ভেতর, এক একটা গিমা শেকড় বাকড়শুদ্ধো উপড়ে তুলে ফেলতে পারলে—তার নামে কেউ দোষারোপ করতে সাহস পাবে না। মা ঠাকুমা গালমন্দ করার আগেই দেখবে, মেয়েটা বনজঙ্গল থেকে সব সবুজ গিমাশাক তুলে এনেছে কোঁচড়ে।

এবং এভাবে পদ্ম মাঝে মাঝেই কোথায় কোনো বড় টিলা পেয়ে গেলে উঠে যাচ্ছে। ডালপালা ফাঁক করে দূরের মাঠ অথবা কাছাকাছি সব জায়গায় খুঁজে দেখছে. ঘোড়াটা আছে কিনা। ঘোড়াটা থাকলেই সে ঠিক নীলদা আর মিলিকে আবিষ্কার করে

ফেলবে। নীলদা কি দাদার মতো পাজি নচ্ছার হয়ে যাবে—সে যদি দেখে ফেলে মিলি গাছের ছায়ায় মাথায় হাত রেখে শুয়ে আছে—তারপর আরও সব বিশ্রী দৃশ্য, মিলি নীলদাকে অ আ শেখাচ্ছে, আর তখনই তার বুকটা ভীষণ কাঁপে। আর কেমন মনে হয় কাছে পেলে নীলদাকে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দিত এখন।

আর ঘোড়াটা কোথাও তখন ডেকে উঠল। কান খাড়া করে রেখেছে পদ্ম। ঘোড়াটা ঠিক একা পড়ে গেছে। কাছে কোথাও মিলি নেই। নীলদা মিলি ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে, জলে ঠিক পা ডুবিয়ে বসে আছে। সে আর একদণ্ড দাঁড়াল না। ঘোড়াটার চিৎকার অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং ঘোড়া না ডাকলে, বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। যত দূরেই যাক নীলদা, গায়ে তার আশ্চর্য সৌরভ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সে এটা টের পাচ্ছে। নীলদার শরীরের ঘ্রাণ পাল্টে যাচ্ছে। চোখ বুজে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে নীলদা আসছে সে টের পায়। আর এখন তো তার ভারি সুসময়। শরীরের সব শিরা উপশিরা জেগে উঠছে। দপদপ করে শরীরের ভেতরে জ্বলছে তারা। সে সহজেই টের পেয়ে গেল, ফকির সাবের দরগার কাছাকাছি কোথাও নীলদা আছে। ঘোড়াটা আর না ডাকলেও সে ঠিক পৌঁছে যেতে পারবে নীলদার কাছে।

চারপাশে সব শিমূলের ফুল, লাল। আর মাঠের গনগনে আঁচ মরে আসছিল। পদ্ম ফ্রক তুলে কপালের ঘাম মুছলে। নীলদাকে কাছে পেলে পালিয়ে বের হয়ে আসা তার বের করে দেবে। যদি মাকে সব না বলেছে তো তার নাম পদ্ম নয়। মা, নীলদা মিলির সঙ্গে কি সব করছিল।

কি সব ভাবছিল এভাবে পদ্ম। তার ফ্রক উড়ছে চুল উড়ছে বাতাসে। শিমূলের লাল ফুল অজস্র, মাথার ওপরে সব লাল ফুল, নিচে পদ্ম, মুখ তার রাঙ্গা হয়ে উঠছে। আর তখনই দূরে

দেখতে পেল মিলি মাঠে। ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কাছে পিঠে নীলদা নেই। সে বুঝতে পারছে নীলদা সেই ফকির সাবের দরগার ভেতরে লুকিয়ে আছে। সে উঠে গিয়ে ডাকল নীলদা। কোনো সাড়া পেল না। দূরে চষা মাঠের ওপর বিকেলের রোদে ঘোড়াটাকে নিয়ে মিলি, না আরও সঙ্গে কেউ যেন, একসঙ্গে মিশে আছে। নীলদা তুমি! মিলিকে আপ্রাণ জড়িয়ে আছে নীলদা, যেন গোটা একটা মানুষ হয়ে গেছে তারা। চষা মাঠের জন্য আর রোদের ঝিল্লিতে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। পদ্ম আর স্থির থাকতে পারছে না। সেই গেছোমেয়েটা তার সব হরণ করে নিচ্ছে। যত দূরে যায় ঘোড়াও যায় দূরে, সে আর ছুটেও তাদের নাগাল পাবে না। ঘোড়ার কেশর মিলি চেপে ধরেছে, নীলদা পেছনে কোমর ধরেছে। দুজন মানুষকে নিয়ে ঘোড়াটা তেমন জোরে ছুটতে পারছে না, না ইচ্ছে করেই সামনে এত বড় মাঠ পেয়ে, খেলা করছে তারা, পদ্ম ঠিক জানে না। সে ফিরে যাচ্ছিল। সে হেরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ছায়া ছায়া অন্ধকারে আরও কেউ নেমে আসে মাঝে মাঝে। যখন এই গ্রাম মাঠ, দূরের সব গাছপালা অথবা প্রজাপতিরা গ্রীষ্মের বাতাসে ডালপালা পাখা মেলে দেয় তখন অগণিত এই জীবনধারার ভেতর ওরা দুজন, দুপাশে অন্ধকার, শুধু কেউ কোন কথা বলে না।

—এই ডলি কি হয়েছে!

—কিছু না।

—কথা বলছ না কেন?

—বাবা ঢাকা গেছে।

—কেন?

—আমার বর খুঁজতে।

—যা!

—হ্যাঁ সত্যি বলছি।

মানু কি বলবে আর ভেবে পেল না। —তুমি আমাকে চিঠি দাও কবিরাজ কাকা জানে?

—কি করে জানবে?

মানু পরেছে কোঁচানো ধুতি। গায়ে হাফসার্ট চেককাটা। ডলি পরেছে সাদা সিল্কের শাড়ি। ছাপা। মিনার মন্দির অথবা তরুলতার সোনালি সব ছবি শাড়িতে। চুলে গন্ধ তেলের সুবাস। চন্দন গোটার গাছের ভেতর ছায়া ছায়া হয়ে আছে তারা। লুকিয়ে খবরটা দিতে এসেছে ডলি।

মানু বলল, মিলি জানে তুমি আমাকে চিঠি দাও!

—কে বলেছে!

—নীল বলল।

ডলি আর কিছু বলতে পারল না। নখে মাটি খুঁড়ছিল কেমন ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। বাগানের ভেতর দিয়ে সরু আলোর সব জাফরি কাটা ছবি ভেসে আসছে। তারপর কি ভেবে বলল তা হলে আমাদের কি হবে?

মানু জবাব দিতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ডলিকে নিয়ে এক্ষুনি পালিয়ে যেতে। কলকাতা বড় শহর—বাবাকে তার ভীষণ ভয়—এবং সে ভেতরে ভেতরে হাহাকারে ভুগছিল।

ডলি বলল, আমি যাই।

মানু পাগলের মতো ডলিকে জড়িয়ে ধরল। এবং চুমো খেল। তার যেন আর কিছু করার কথা মনে আসছে না। কি সুন্দর হয়ে যাচ্ছে ডলি। তার নরম শরীর আকণ্ঠ মিশে আছে তার শরীরে। ডলি দু হাতে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে তাকে।

মানুর কিছুতেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। এবং সে ধীরে ধীরে কেমন মাতালের মতো হয়ে উঠছে। চারপাশে অন্ধকার, বড় বড় সব চন্দন গোটার গাছে নির্জনতা। মাথার ওপরে গাছের ফাঁকে

কিছু নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। সে প্রায় পাগলের মতো ডলিকে দু হাতে তুলে নিল। নিচে নরম ঘাস প্রায় যেন কোনো সংজ্ঞাহীনা রমণীর মতো তাকে ঘাসে শুইয়ে দিল। ডলির শরীরে কি যে সব প্রবহমান হচ্ছে। সে কিছুতেই বাধা দিতে পারছে না। জীবনের কাছে এমন মহিমময় কিছু পাওনা থাকে মানুষের ডলি আগে যেন জানত না। তার চোখ বুজে আসছিল। সে কিছুতেই মানুকে বাধা দিতে পারছিল না। সজীব ফুলের মতো সে তখন ঘাসের ভেতর ফুটে আছে।

গাছপালার ভেতর তারপর দুজনই চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

ডলি একসময় বলল, মানু এটা কি করলে!

মানু ডলির দিকে তাকিয়ে থাকল।

ডলি বলল, আমার বিয়ে হলে তোমাকে কিছুতেই আর ভুলতে পারব না।

মানুর মাথায় যে কি হয়! সে কেমন ফের ওকে বুকে টেনে বলল, চল আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—কোথাও আমরা চলে যাব।

—তুমি কি।

—কেন আমি কি!

—হুট করে যাব বললে যাওয়া হয় না।

মানু বলল, তুমি আমাকে ভালবাস না।

ডলি বলল, তাইতো বলবে।

—তবে যাবে না কেন?

—লোকে কি ভাববে!

—লোকের ভাবাভাবিটা বেশি হল।

ডলি বলল, ছেলেমানুষী কর না মানু। তুমিতো সবই দেখলে। আমার বিয়ে হলে তুমি কিন্তু আর চিঠি দেবে না।

— বিয়ে হতেই দেব না।

— খুব সাহসী।

— ছ্যাখো।

— কি দেখব!

— ঠিক একটা কিছু করে ফেলব।

সামান্য জোৎস্না চারপাশে সাদা কবুতরের মতো বসে আছে। মাথার ওপর সেই সব চন্দন গোটার গাছ। গাছের ডাল পাতা চুঁইয়ে জোৎস্না নেমেছে। ভারি অলৌকিক মনে হচ্ছিল সময়টা। দূরে কোথাও কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ডলির ভাল লাগছিল না। মানু যা একজন মানুষ, যা খুশি কবে ফেলতে পারে। সে কি করবে, কেন যে সে মানুকে চিঠি লিখতে গেল। বাবা ফিরে এলে তার সাহসই হবে না, সে বলতে পারবে না, বাবা মানু কিছু একটা করে বসতে পারে — এখন আমার বিয়েব জন্য ভাবতে হবে না। যতই সাদা কেডস্ পরে সবুজ লনে কর্কটাকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখুক, যতই সে সব দিক না কেন, বাবাব সামনে দাঁড়াবাব সাহস তার নেই। সে বলল, মানু, কাল এস। আবার আমরা এখানে বসব।

মানু বলল, আমি কোথাও এখন যাব না।

— যাও। লক্ষ্মী ছেলেতো।

— না যাব না।

— আর কি করবে!

— সারারাত আমরা এখানে থাকব।

— মা জেগে গেলে।

— জেগে গেলে তোমাকে খুঁজবে।

— ধরা পড়ে যাব মানু। আমি যাই।

— না। বলে সে আবার ঘাসের ওপর ডলিকে শুইয়ে দিল। গ্রীষ্মের সময়। হাওয়া দিচ্ছে। সে পাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। ডলি শুয়ে আছে। এবং তেমনি আকাশ আর নিরিবিলি গাছপালা।

ছুটো একটা জোনাকি পোকা উড়ে গেল। ভারি ফ্যাকাশে লাগছিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, আর কোনো সরিসৃপ হেঁটে বেড়াচ্ছিল কোথাও। খস খস শব্দ উঠছে। সে ধীরে ধীরে, ডলির সুন্দর নরম স্তনে হাত রাখল। এবং খোলামেলা, অথবা ধীরে ধীরে, তেমন অধির আগ্রহে নয়, বরং কিছুটা ডলিকে নিজের মতো করে রয়ে সয়ে শরীরের সর্বত্র সুন্দর সুষমায় ভরে দিতে থাকল।

ডলি বলল, আমি মরে যাব মানু।

— আমিও মরে যাব।

— সেই ভাল। ডলি কেমন সহসা একটা সহজ পথ পেয়ে গেছে। সে উঠে বসতে চাইলে মানু ফের তাকে শুইয়ে দিল। এবং মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, মানুষ এ-ভাবে বুঝি মরে যায় ডলি ?

— মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কি একটা স্বপ্নের মতো সময় ডলিকে আপ্লুত করে রাখছে !

সে বলল, জানো আমার একটা ছবি ছেলের বাড়িতে বাবা পাঠিয়েছে ?

মানু বলল, ঠিকানাটা দেবে ?

— কার ঠিকানা !

— যেখানে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে।

—কি হবে ঠিকানা দিয়ে ?

—ওদের লিখে জানাব।

—কি লিখবে ?

—লিখব ডলি একজনকে ভালবাসে। তাকে না পেলে ডলি মরে যাবে।

—না না ওসব লিখতে যেও না।

—তবে আমি কি করব ডলি !

ডলি পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। সত্যি সে কিছু বলতে পারল

না। বরং মনে হল, এমন সুন্দর জোৎস্নায় পুকুরের জলে ডুবে গেলে কেমন হয়। ডলি বলল, মান্নু এস আমরা তুজনে মরে যাই।

মান্নু পাশে কেমন অবোধ বালকের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, ডলি সেই ভাল।

ডলি উঠে দাঁড়াল। কেমন এক বাহ্যজ্ঞানশূন্য রমণীর মতো হেঁটে গেল কিছু দূর। তারপর সহসা মনে হল, সে ভাল সাঁতার জানে। মান্নু জানে না। জলে নেমে গেলে মান্নু সত্যি ডুবে যাবে। কিন্তু সে ডুবে যেতে পারবে না। তার বার বার ওপরে ভেসে উঠতে ইচ্ছে হবে। সে বলল, মান্নু আজ যাও। কাল আবার আমরা এ-নিয়ে ভাবব।

॥ দশ ॥

তখন ফুলু মাসি চিৎকার করছিল! তোমাকে হতভাগা দূর করে দেব। পাজি নচ্ছার কোথাকার! গরুগুলো মাঠ থেকে কে আনবে। এক খোঁটায় ওদের পেট ভরবে কেন। যা সময়, ঘাস পাতা কিছু নেই আর তোমার পাড়া বেড়ানো। আসুক বড়বাবু, এবার বিদায় করে দেব।

নীল একটা কথা বলছিল না। সে তার ঘরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। ছোট দাতু বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। তাঁর গুড়ুক গুড়ুক শব্দ। পদ্ম তক্তপোষে বই নিয়ে বসে আছে। আর ভেতর বাড়িতে মেজ মামী গজ গজ করছেন—যদিও নীল সব বুঝতে পারছে না—তার মনে হচ্ছিল, সত্যি সে ভীষণ একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে! গরুগুলো মাঠে দিয়ে আসে সে। তার মনেই ছিল না, সংসারে যাবতীয় কাজ তার ক্রমে ভারি হয়ে উঠছে। অন্ধকারে নেমে গেলে দাতু বললেন, দেখ বিশাটা কোথায় গেছে? দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। খুঁজে পেলাম না।

সে বুঝতে পারছে ছোট দাদু মাঠ থেকে গরু বাছুর নিয়ে এসেছে। কেবল দুধালো গরু বিশাকে আনতে পারে নি। এখন অন্ধকারে সারা গ্রাম মাঠে খুঁজে বেড়াতে হবে। কারো কোনো বাগান অথবা সবজি খেতে মুখ বাড়ালে বেঁধে রাখতে পারে। খোঁয়াড়ে দিতে পারে। এত অনিষ্ট করার স্বভাব বিশার যে নীল রাগে দুঃখে লণ্ঠন হাতে বের হয়ে গেল। পদ্ম সব দেখছে—নীলদা ভাতু স্বভাবের মানুষ। সে একা খুঁজে বেড়ালে ঠিক কোথাও ভয় পেয়ে পড়ে থাকবে। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। বিকেলের সব রাগ দুঃখ নিমেষে তার কেমন জল হয়ে গেল। সে বলল, দাদু আমি যাই নীলদার সঙ্গে .

—যা।

ফুলুমাসি সহসা বাড়ি মাথায় করে ফেলল, কোথায় যাবে! ধিঙ্গি মেয়ে। তুমিও কম যাও না। আসুক মেজদা বাড়িতে, দেখাচ্ছি তোমাদের মজা। পদ্ম কেমন গুটিয়ে গেল ভয়ে। ফুলুপিসি কি তার ভেতরের ইচ্ছে সব টের পায়। সে কি জেনে ফেলেছে সব। তার মনের ভেতরে আশ্চর্য সব ইচ্ছেরা যে খেলে বেড়ায়, পিসি বুঝি সব টের পেয়ে গেছে। সে যে নীলদাকে না দেখতে পেলে হাহাকারে ভোগে! নীলদার জন্য এত কেন কষ্ট তার! ফুলু পিসি বদজাত, ভীষণ বদজাত—নীলদাকে মার মতো কষ্ট দেওয়ার স্বভাব। সে কেমন এবার জেদী হয়ে গেল। আবার বলল, দাদু আমি যাই?

—যা।

সে আর এক দণ্ড দাঁড়াল না। দৌড়ে নেমে গেল উঠোনে। বলল, নীলদা দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।

সহসা মা কোত্থেকে ছুটে এসে প্রায় ঝড়ের মতো পদ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুল ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকল—কোথায় যাবে! পড়াশোনা পাটে তুলেছ তোমরা সবাই। বুড়টা অমানুষ হচ্ছে

তুমিও কম বদজাত না। যাও পড়তে বসো। আমার হাড়মাস তোমরা সবাই মিলে কত আর খাবে ?

তারপর সহসা বাড়িটা কেমন নিঝুম। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। গ্রীষ্মের দিনে নিষ্ঠুর গরমের ভেতর ঝিঁঝি পোকারা কি যে দ্রুত ডেকে বেড়ায়। পদ্ম উপুড় হয়ে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল। ছোট দাদু তেমনি তামাক খাচ্ছেন। বিরাম-বিহীন অন্তহীন সেই গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানার শব্দ। ফুলু মাসি আয়নায় মুখ দেখছিল। বিয়ে হচ্ছে না, বর খুঁজে হয়রাণ, খরচপত্র আছে কত—নলিনীর দিনকে দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে চিন্তায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়, এমন অজপাড়াগাঁয়ে সে আর কিছুতেই পড়ে থাকবে না। চিঠিতে নলিনী, মানু কিভাবে দিনকে দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে তার মোটামুটি একটা লিস্ট আজকাল পাঠাচ্ছে। সুধন্য দেশে গেছে, সে আর ফিরে না এলেই ভাল। কে যোগাবে হাতির খোরাক! ছোটদাদুর নামে যে টাকা আসে নলিনী সবই প্রায় এখন নিয়ে নিচ্ছে। নীলের অনেক খাওয়ার খরচ আর নীল বড় বেশি আহার করে থাকে। ভাত দিলে সে কখনও না করে না। খেতে খেতে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তবু খায়। খেয়ে উঠে দম ফেলতে পারে না মতো নীল হেঁটে যায়। কোনো কোনো দিন বিদ্বেষে নীলের ভাত লাগবে কিনা পর্যন্ত বলতে ঘৃণা করে তার। নীলের স্বভাব নয় চেয়ে খাবার। না দিলে চুপচাপ আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে। কখনও বলবে না আমার পেট ভরেনি মামীমা। আর দুটো ভাত দিন।

পদ্ম বোঝে সব। দুবেলা দুটো ভাত আর কিছু না। নীলদার বড় ভয়। ভাত যা পাবে সবটাই খেয়ে নেয়া দরকার। যেন পাকস্থলীর ভেতর তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। অসময়ে কাজে লাগবে। সেই নীলদা এখন লণ্ঠন হাতে মাঠে মাঠে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশা তুই কোথায় ? ও বিশা। তোকে নিয়ে যেতে না পারলে

মামীমা আমাকে খেতে দেবে না। বিশা, লক্ষ্মী তুই একবার সাড়া দে!

—কে যায়? দত্তদের বুড়ো দত্ত হাঁকে।

—আমি নীল। আমাদের বিশাকে দেখেছেন?

বুড়ো দত্তের হাঁপির টান গলায়, শীত গ্রীষ্মে কমফরটার জড়ানো থাকে। বলল, না। শ্বাস কষ্টের ভেতর লোকটা তবু আবার বলে, ছাখ ঢালিদের বাড়িতে আছে কিনা? ঝোপ জঙ্গলে ঘাস পাতা খেয়ে বেড়াতে পারে।

নীল ডেকে চলেছে—বিশা। বিশা। কবিরাজ বাড়ির পাশ দিয়ে নেমে গেলে জানালায় মুখ বাড়িয়ে কে বলল, নীলদা কোথায় যাচ্ছ? নীল লণ্ঠন তুলে বলল, বিশা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে মিলি। কোথায় যে গেল!

মিলি বারান্দায় বের হয়ে বলল, এই নীলদা।

—কি?

—আলোকে নেবে। বাবা বাড়ি নেই। আমি যাব?

—ঘোড়া নিয়ে কোথায় যাব। তুই কেন যাবি!

—তা হলে ভয় করবে না তোমার!

নীল বুঝতে পারল, মিলি তার ভয়ের কথা ভাবছে। সে খুব ভীতু কিছুতেই মিলিকে বুঝতে দিল না। বলল, না। ওটা আবার কোনদিকে ছুটবে! সে লণ্ঠন নিয়ে নেমে যেতে থাকল। আকাশ কালো এবং অন্ধকার। গ্রীষ্মের দিনে যে কোন সময় ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে। সে এবার আরও নিচে সব জলাশয় পার হয়ে ডাকল, বিশা তুই কোথায়। ঘোষপাড়ায় সে গেল, বাড়ি বাড়ি সব চাকর মুনিষদের অথবা অবনীকে বলল, আমাদের বিশাটা যে কোথায় দড়ি ছিঁড়ে পালালো।

অবনী বলল, সিঙ্গিদের বাড়িতে কার গরু বেঁধে রেখেছে। দেখগে তোদের বিশা হয়তো।

সে সিঙ্গিদের বাড়িতে গেলে দেখল হারান সিঙ্গির বউ উদোম গায়ে বারান্দায় শুয়ে একা। নীল ভয়ে ভয়ে বলল, আমাদের বিশা এদিকে এসেছে?

উদোম গায়ে হারান সিঙ্গির বৌ উঠে বলল, কে নীল কর্তা! না তো। আপনাদের কোনো গরু এদিকে আসে নি।

কোথায় যে গেল! সে লণ্ঠন ঝুলিয়ে নেমে গেল মাঠে। কি গভীর অন্ধকার! মাঠের আলে আলে সে হেঁটে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো দুলছিল—প্রায় বাতাসে কাঁপছিল। মাথার ওপরে অবিরাম আকাশের নক্ষত্রমালা সরে সরে যাচ্ছে। তাব ভীষণ ভয় করছিল। পরীক্ষার পড়া সে বিন্দুমাত্র করতে পারে নি। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। সে এবাবে কেমন মনমরা হয়ে বলল, আস্তানা সাব আমার ভয় করছে। বিশাকে তুমি পাইয়ে দাও। তোমাব দরগায় মোমবাতি জ্বালব।

এবং তখনই সে দেখতে পাচ্ছে কেউ আবার নেমে আসছে মাঠে। হাতে লণ্ঠন। কেউ হবে, ওকে ডাকছিল, নীলদা বাড়ি এস। বিশা নিজেই চলে এসেছে। বুঝতে পারল সেই পদ্ম। যতবার যা কিছু হারায় আস্তান সাবের নামে মানত কবলে সে তা পেয়ে যায়। পদ্ম কাছে এলে দেখল, সঙ্গে ছোট দাদু। ছোট দাদু আর পদ্ম ওকে খুঁজতে এসেছে।

নীল যেতে যেতে একা পদ্মকে কাছে ডেকে বলল, পদ্ম যাবি?

—কোথায়?

—মোমবাতি জ্বেলে দেব দরগায়। তুই সঙ্গে থাকবি। একা আমার ভয় করে। মানত করলে দিতে হয়। না দিলে ফকিরসাব রেগে যাবে।

এভাবে নীল আর পদ্ম কাছাকাছি পাশাপাশি বড় হয়ে উঠছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে ডলির বিয়ে হয়ে গেল। মানুদা ডলির বিয়ের ক'দিন আগে কেমন ধার্মিক মানুষ হয়ে গেল। সে দু বেলা ঠাকুর ঘরে বসে

কি জপতপ করত। ছোট দাছুর নামাবলি গায়ে বসে থাকত। একদিন সকালে সে নামাবলি গায়ে চলে গেল, দূরের চিনিশপুরের কালীবাড়ি। সেখানে তুদিন কাটিয়ে যখন ফিরে এল, উসকো-খুসকো চুল, চোখ জবা ফুলের মতো লাল। চেনা যায় না মতো খাওয়া-দাওয়ার পাট একদম তুলে দিয়েছে। এবং এক রোববারে বাড়িতে সবাই দেখল, সে কেমন মৃগী রোগীর মতো ভিরমি খেয়ে পড়ে গেছে।

ডলি তখন পাল্কি করে চলে যাচ্ছে। দূরের মাঠে বাগু বাজছিল। মিলির বাবা খবর পেয়ে ছুটে এল। নাড়ি দেখে বলল, খুব তুর্বল। এবং এ-ভাবে খবর রটে যায়. ভূইঞা বাড়ির মেজকর্তার বড় ছেলের অসুখ। কি অসুখ কেউ ধরতে পারে না। সময় অসময় নেই ফিট হয়ে যায়। গরমের সময়, ঠাণ্ডা যা কিছু, এই তরমুজের রস, কাঁচা আমের সরবত, এবং যা কিছু অষুধপথ্য সব দরকার, যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে গেল সবাই। কাজেই নীলের যা কাজ ছিল, তার চেয়ে এখন এ-সংসারে বেশি কাজ। সুধন্য দেশ থেকে আর ফিরে এল না। মেজমামী চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে. সুধন্য তোমার এসে আর কাজ নেই। নীলতো আছে. সে যখন সব চালিয়ে নিতে পারছে আর কি দরকার তোমার। দিন দিন সংসারে অশান্তি বাড়ে। মেজ মামা এলেন, আষাঢ়ের এক বর্ষায়। খবর পেয়ে আসতে পারেন নি। ছুটি-ছাটার ব্যাপাব আছে—বললেই হুট করে আসা যায় না। বেশ ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। মাঠ-ঘাট জলে ভেসে গেছে। ঘোড়াটা আবার বন্দী হয়ে গেছে ছাড়া-বাড়িতে। বিকেল হলে মিলি বসে থাকে, নীল আসবে। ডলিদি আবার এসেছে, কেমন লাল চেলি, মাথায় টায়রা, মুখে সব সময় আশ্চর্য সুন্দর সব চন্দনের মতো স্নিগ্ধতা। নীলকে মাঠে দেখলেই ইশারায় ডেকে জিগ্যেস করে—এই নীল, মান্নুদা এখন কেমন আছেরে!

—মান্নুদার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কি যে একটা অসুখ!

—আজ তোদের বাড়ি যাব। মান্নুদাকে বলবি।

—বলব।

নীল তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, মান্নুদা ডলিদি আজ আসবে।

মান্নুদার যেন কোনো উৎসাহ নেই—সে ডলিদিকে চেনে না মতো।

বিকেলে এল ডলিদি আর তার বর। ডলিদি এ ক'দিনে আরও সুন্দর হয়েছে। বর ভারি রূপবান। সওদাগরের মতো চেহারা। একটু যেন বেশি বয়সের মানুষ। নতুন পাম্পস্ু জুতো, গায়ে পাতলা সিল্কের চাদর, চোখ ছোট, ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাঁটা, এই লোকটাই ডলিদিকে জোর করে নিয়ে গেল মান্নুদার কাছ থেকে— কতদিন ভেবেছে বলবে, জানিস পদ্ম মান্নুদা ডলিদিকে ভীষণ ভালবাসত। সব অসুখ আমি জানি ডলিদির জন্য। কিন্তু সেতো কিছু বলতে পারে না। খবর জানাজানি হয়ে গেলে মান্নুদা লজ্জায় মরে যেতে পারে। ভারি কলঙ্ক এসবে। সে সব নিজের ভেতর রেখে দেয়। পৃথিবীর কাউকে জানতে দেয় না। ডলিদি মান্নুদাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি দিত। চিঠিগুলো মান্নুদা ভয়ে একটাও কাছে রাখেনি, সেই চিঠি পড়ে কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে, কত দূরে যে চলে যেত মান্নুদা! সে বুঝতে পারত, এই যে মান্নুদা ভালমানুষের মতো মিলিদের ছাড়াবাড়ি পার হয়ে নির্জন একটা মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে, সে শুধু ডলিদির চিঠিটা ভাল করে পড়বে বলে, পড়ে পড়ে বিকেলের মরা আলোতে একসময় চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে, চিঠিটা, কুটি কুটি করে, যেন একটা অক্ষরও কেউ উদ্ধার করতে না পারে, যেন কেউ টের না পায় জোড়া লাগিয়ে, কারণ মানুষের শত্রুতারতো শেষ নেই, কে কি ভাবে টের পেয়ে যাবে! চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিত না, সেই সব ছিন্নভিন্ন চিঠির অন্তহীন রহস্য এখনও সে জানে—মান্নুদা খুব যত্নের সঙ্গে সবুজ পাতার ভেতরে গাছে গাছে লুকিয়ে রেখেছে। যেন এ গাঁয়ের কোনো না কোনো গাছে তার সাক্ষ্য

এখনও পাওয়া যাবে। ঝড়-বাদলে ভিজেছে, এক পবিত্র ইচ্ছের কথা। রাতদিন রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে—আর তখনই পদ্মকে দেখার জন্য সে কেমন আকুল হয়ে যায়। মিলির জন্য প্রাণের ভেতর কি যে বাজে। মিলি বাড়ি না থাকলে, কবিরাজ বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। কবিরাজ মামা, তাকে রাংতায় মোড়া হলুদ কাগজে ব্রুকবণ্ড চা আনতে দেন। স্কুলের পাশে অনিল সাহার চায়ের দোকান, এত বড় বিশ্বাসী কাজ কবিরাজ মামা একমাত্র তাকেই দিতে পারেন। সে খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে আসে। সন্ধ্যায় ম্লান আলোতে সে চায়ের প্যাকেট হাতে করে যখন উঠে আসে, তখন কবিরাজ মামার গলা, কিরে নীল, এনেছিস। এক পাউণ্ডের এক প্যাকেট চা। কি সুন্দর! একদিন মিলি ওকে বলেছিল, এই নীল-দা চা খাবে। নীল ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। সে এ-বয়সে চা খেয়েছে শুনলে দাদু ভারি রাগ করবে। তাকে ফুলুমাসি তবে কালই দেশে পাঠিয়ে দেবে। সে বলেছিল, যা। চা খাব কিরে!

মিলি বলেছিল, আমি খাই।

নীল বলেছিল, শহরে থাকলে আমিও খেতাম। শহরে থাকলে অনেক কিছু তাড়াতাড়ি শেখা যায়। গাঁয়ে থাকলে হয় না। কিন্তু ওদের বাড়িটা যে কি! পদ্মতো শহরের মেয়ে, শহরে বড় হয়েছে, পদ্মর অবশ্য তখন খুব ছোট বয়েস ছিল, এখনকার মতো বয়সে পদ্ম শহরে থাকলে ঠিক চা খেত। এবং যখন মিলি বলেছিল সে চা খায়, নীলের চোখ কেমন বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছিল। ভেতরে ভেতরে এই মিলি তার চেয়ে সব দিকেই বড়, এবং তাজা। মিলির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না। ওর লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, কত দ্রুত সব কিছু সে করে ফেলতে পারে। পদ্ম ঠিক যেন মিলির মতো সব পারে না।

তবু একদিন কি যে হয়ে গেছিল তার। কবিরাজ মামা ডিসপেনসারিতে। হামানদিস্তায় কোনো শব্দ উঠছে না।

ডিসপেনসারির বারান্দায় লাইন দিয়ে রুগী বসে আছে। পোস্টাফিসে তালা বন্ধ। পাশের মাঠ পেরিয়ে লম্বা সান-বাঁধানো লাল বারান্দা, জানালায় মিলি। সে স্কুল থেকে ফেরার পথে সেই সোনালি প্যাকেট মিলিকে দিলে বলেছিল, এই নীল-দা।

—কি !

—মা বাড়ি নেই।

নীল বুঝতে পারছিল না, কেন এ-সব বলছে।—তুমি ভেতরে এসো না নীলদা।

সে বলল, কবিরাজ মামা……

—বাবা এখন আসবে না। আমাদের চা হয়েছে। আমি করেছি। তুমি খাবে।

নীল ভীষণ একটা অপরাধী মুখ করে রেখেছিল। যেন পৃথিবীতে সে এর চেয়ে বড় পাপ জীবনে করেনি। কি লোভ তার—যখন সোনালী কাপে চা এল, সে পা ঝুলিয়ে লুকিয়ে খেতে গিয়ে ভীষণ কেলেঙ্কারী, জিভ প্রায় সবটাই পুড়ে যেতে সে বলল, মিলি, ইস কি গরমরে। জিভ পুড়ে গেল। মিলি হাসছিল।—এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন ? বাবা দেখলে কিছু বলবে না

নীল তবু বলেছিল, কাউকে বলিস না।

মিলি বুঝতে পেরেছিল, পদ্মকে না বললেই নীলদা খুশি। সে বলল, না, পদ্মকে বলব না।

—বললে কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ হবে। দেখবি ঠিক আমি মানুদার মতো অসুখে পড়ে যাব তবে।

মিলি ভীষণ হেসেছিল। বলেছিল, তুমি খুব ছেলেমানুষ নীলদা।

ভীষণ একটা গোপন পাপ কাজের মতো মনে হয়েছিল নীলের। বর্ষাকাল বলে সে নৌকায় স্কুল থেকে ফিরছে। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে ফিরতে তার। নৌকায় ফিরতে ভীষণ সময় লেগে যায়।

সারাটা পথ ওরা সবাই পালা করে লগি মেরেছে। কখন খেয়ে গেছে, এখন গিয়েও সে কিছু খেতে পাবে না। রাতে সে খাবে। অন্যদিন সে ফিরে গরুবাছুর নিয়ে যাবার সময় গাছে গাছে ফলপাকুড় সংগ্রহ করে বেড়ায়। কখনও সে দেখতে পায়, কোনা পাকা আম গাছতলায়, জাম জামরুল, বাতাবি লেবু, আখের দিনে আখ। সে এমনিতেই সন্ধ্যা করে ফিরেছে, তারপর সেই গোপন পাপের জন্য—মনটাও খুব প্রসন্ন না। মেজমামা খুব একটা খারাপ মানুষ না। বরং মেজমামা ওর জন্য দুটো উড-পেনসিল নিয়ে এসেছে। দুটো উডপেন্সিল পেয়ে মেজমামাকে তার মনে হয়েছে তিনি খুব উদার মানুষ। পদ্মের জন্য দুটো উড-পেনসিল মানুদার জন্য দুটো। তাকে দু দিস্তে সাদা হাতিমার্কা কাগজ দিয়েছে। অফিসে মেজমামা এগুলো বিনে পয়সায় পান। আপন পর নেই—মেজমামা সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। এবং মেজমামা এসেছেন বলেই খাওয়া-দাওয়া কদিন খুব ভাল হচ্ছে। ভাল মাছ যা বাজারে, দিয়ে যাচ্ছে জেলেরা। পদ্মর জন্য নতুন ফ্রক এনেছেন। সুন্দর মখমলের মতো নরম। মানুদার জন্য ফুলপ্যাণ্ট। সে দেখেছে, পদ্ম ফ্রক পরে যখন ঘুরে বেড়িয়েছে তখন সে তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে। মানুদার যেন কোনো সখ নেই। সে ওটা ছুঁয়েও দেখেনি। মেজমামার সঙ্গে একটা কথা বলেনি। মেজ মামা দুদিন মুখোমুখি হতে চেয়েছেন, কেমন এক ঘোলা-ঘোলা চোখ, এবং এক সকালে আবার মানুদা বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেল। এল অনেক রাত করে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। মেজমামা আর রাগ সামলাতে পারলেন না। আগাপাশতলা পেটালেন গরু বাঁধার খোঁটা দিয়ে। কেউ মেজ মামাকে রুখে দাঁড়াতে পারল না। মানুদা একটা গাছের মতো দাঁড়িয়েছিল। একটুও নড়ছিল না। সবার চিৎকার চেঁচামেচি—মেরে ফেলছিস নবীন, কি করছিস তুই! বলে ছোট দাদু ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন মেজমামায় ওপর। রাতের অন্ধকারে, সবাই লণ্ঠন

হতে ছুটে এসেছিল। পদ্ম হাউ হাউ করে বারন্দার পাল্লা ধরে কাঁদছে। পদ্মকে কাঁদতে দেখে সেও ভ্যাঁক করে কেঁদে দিয়েছিল। মানুদাকে সে খুব ভালবাসে, পদ্মকে যেন আরও বেশি। ফুলু মাসি বলছিল, বেশ করেছে, জ্বালা কত সহ্য হয়!

নীলের মনে হয়েছিল, ঠাস করে ফুলু মাসির গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে ঠিক হয়। কে দেবে।

রাতে আর নীলের পড়া হল না। কেমন শংকা ভেতরে। মান্নুদা কিছু একটা ঠিক করে বসবে। দিন দিন চাপা স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। রাতে ওর কাছে পদ্ম কেঁদেছে। বলেছে, নীলদা, দাদা এমন কেন হয়ে যাচ্ছে। নীল সকালে বলল,—মানুদা স্কুলে চল। ওর মনে হয়েছিল কোনোরকমে স্কুলে নিয়ে যেতে পারলে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ডলিদি ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে ঠিক করেনি। কেমন বেহায়া মনে হয়েছে। কত সহজে ডলিদি সব ভুলে গেল। মান্নুদা ওদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। বোঝাই যায়নি কোনো দুঃখ আছে তার। এবং এভাবে কি হয়ে যায়। সে বারবার বলেও রাজি করাতে পারেনি—আর তখনই দরগার সেই ফকিরসাবের কথা মনে পড়ে যায়। ফকিরসাব তুমি মান্নুদাকে ভাল করে দাও। সে একদিন বলল—পদ্ম যাবি?

—কোথায়?

—দরগায়।

—কি করে যে যাই!

নীল বলল—তুই আমি মিলি। তিনজনে গেলে ভয় করবে না।

পদ্ম বলল—পালিয়ে ঠিক চলে যাব।

নীল বলল—মানত করে না দিলে ভাল হয় না। দিতে পারলে মানুদা ঠিক ভাল হয়ে যেত।

মেজমামা ফের কলকাতায় চলে গেছে, কথা আছে মেজমামা বাসা পেলেই ওদের সবাইকে ফের নিয়ে যাবে। সব তার নষ্ট হয়ে গেল, যুদ্ধ কতভাবে যে মানুষের অপকার করে থাকে—কোথাও যুদ্ধ না হলে মেজমামা ওদের এভাবে এমন অজপাড়াগায়ে ফেলে রাখতেন না বছরের পর বছর। নীল বলেছিল তখন, পদ্ম, তোরা সত্যি চলে যাবি?

পদ্ম বলেছিল—আমি কোথাও যাব না নীলদা। এখানেই থাকব। ছোট দাদু ঠাকুমা আছে। তুমি আছ।

নীল বুঝতে পেরেছিল ভারি সরল বিশ্বাসে কথা বলে মেয়েটা। সে বলেছিল, মেজমামা তোকে এখানে রাখবে না।

তখন আকাশে ভারি মেঘ। কদিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি, শরৎকাল চলে যাচ্ছিল। দুর্গোপূজোর বাজনা আর বাজছে না। হেমন্তে ধানের শিষ আসছে। বৃষ্টি আর ভেজা বাতাসের গন্ধের সঙ্গে উঠে আসছিল ধানে-ফুলের গন্ধ। তখন পদ্ম বলেছিল—নীলদা আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

এই একটা বয়সে তার, যখন সহজেই সব বলা যায়। কোথাও পদ্ম যেতে চায় না। পদ্ম নীলকে ফেলে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। সে বলেছিল, পদ্ম তোরা চলে গেলে আমিও আর এখানে থাকব না।

—কোথায় যাবে নীলদা? তুমি পড়াশোনা করে বড় হবে না! পিসেমশাই কত আশা করে আছে।

—কি যে করি!

তখন দক্ষিণের বাতাস আর বইছে না। শীতের হাওয়া বইছে। হেমন্তকালের মাঠ। চারপাশে সোনালী ধানের ছবি। এবং ফসল তোলার তখন সময়। মেজমামী ফুলুমাসি অষ্টমী স্নানের মেলায় গেল। ছোট দাদু আর নীল মানুদা এবং পদ্ম বাড়িতে। দিদিমার মেলার কাছে বাপের বাড়ি, আগেই চলে গেছে।

পদ্ম থাকল বাড়িতে। ললিত সাধুর আশ্রমে মানুদার নামে মানত আছে। মেজমামী মানত দিতে গেছে। ফেরার সময় নদীতে ডুব দেবে। অষ্টমী স্নানে পাপ ধুয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে গেছে ওরা। পদ্ম নীল রান্নাঘরে—রান্না হয়েছে মাছের ঝোল ভাত। পদ্ম ডাকল, দাদা খেতে আয়। নীল স্নান করে এসেছে। গরুর দুধ আছে। মাছের ঝোল ভাত, দুধ। পদ্ম পরিবেশন করছে। ফ্রক গায়ে মেয়ে বসে থাকলে কেমন রুপোলি নদীর কথা মনে হয় নীলের। সে বিকেলে চুপি চুপি বলেছিল—এই পদ্ম তুই শাড়ি পর না দেখি।

পদ্মর মুখ রাঙা হয়ে গেছিল। বলেছিল—পরব।

মানুদা যেমন বের হয়ে যায় গেছে এবং কোনো গাছের নিচে বসে থাকে চুপচাপ, কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, কিছু বললে জবাব দেয় শুধু, তখন পদ্ম ঘরে শাড়ি পরে ডাকল, নীলদা আমাকে দেখবে বলেছিলে।

নীল পূবের ঘরে অংক করছিল। পদ্ম তাকে ডাকছে। পদ্ম দক্ষিণের ঘরে থাকে। পদ্ম সেখানে কি দেখাতে চাইছে। সে কখন ওকে শাড়ি পরতে বলেছিল মনে নেই। সে তার বই খাতাপত্র ভাঁজ করে যাবে। দেরি হচ্ছিল তার। পদ্মর সবুর সইছে না। আবার ডাকছে। —কী নীলদা আসছ না কেন?

সে বলল—যাই রে। তারপর লাফিয়ে বের হয়ে এল ঘর থেকে। বিকেলের মরা আলো সারা বাড়িটাতে। গাছপালায় ঢাকা বলে, মনে হচ্ছিল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে উঠোন পেরিয়ে দু লাফে ঘরে ঢুকে অবাক। পদ্মকে সে দেখতে পাচ্ছে না। সে চারপাশে খুঁজতে থাকলে বলল—এই যে এখানে। পদ্ম ওপাশে আলমারির পাশে গোপনে লুকিয়ে আছে। শাড়ি পরায় একেবারে চিনতে পারছে না। কত লম্বা, কত বড় দেখাচ্ছে পদ্মকে।

পদ্ম বলল—কাছে এস না।

পদ্ম মামীমার একটা দামী সিল্কের শাড়ি পরেছে। মামীমার

ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে। ঢোলা ব্লাউজের ভেতর ওর শরীর শীর্ণ দেখাচ্ছিল। আর কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পদ্ম। তার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

নীল বলল—কেউ দেখে ফেললে পদ্ম!

—তুমি এস নীলদা, তুমি আমার চেয়ে কত লম্বা দেখি।

নীল কাছে গেলে পদ্ম ওর আরও কাছে চলে এসে দুহাতে জড়িয়ে হাত তুলে মাপল, মাত্র চার আঙ্গুল, দ্যাখো তুমি আমার চেয়ে খুব বড় না। বলে সে কেমন আরও জড়িয়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাপছে। নীল একটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লতাপাতার মতো ওর শরীর জড়িয়ে থাকতে চাইছে পদ্ম, বড় নীচু গলায়, যেন স্বর বের হচ্ছে না—পদ্ম বলল—যাবে নীলদা?

—কোথায়।

—এই কোথাও। তারপর ধীরে ধীরে বলল—আস্তানা সাবের দরগায়। আমরা দুজনে মোমবাতি জ্বালাব। কেউ বাড়ি নেই। দৌড়ে চলে যাব দৌড়ে ফিরে আসব।

এই সব কথার ভেতর পদ্মের যে কি হচ্ছে! পদ্ম বুঝি পৃথিবীর যাবতীয় অমঙ্গল থেকে ধরণীকে পবিত্র রাখতে চায়। সে বলল—যাব পদ্ম। মোমবাতি জ্বেলে দিতে না পারলে মামুদা সত্যি আর ভাল হয়ে উঠবে না।

ছোট দাদু সারা বিকেল ধরে একটা গাছ লাগাবার জায়গা করছিলেন। বাড়ির চারপাশে যত গাছপালা, এই যেমন লম্বা তাল-গাছটা দাদু এনেছিলেন মুড়াপাড়া থেকে। তিনি দুজন মুনিষের সঙ্গে গাছটার সঙ্গেই পায়ে হেঁটে দশ ক্রোশের মতো পথ হেঁটে এসেছিলেন। বাড়িতে যতবার তালের আঁটি পুতে গাছ লাগাতে গেছেন মরে গেছে, ঠিক জল হাওয়া না হলে যা হয়, এবং কি করে তিনি জেনেছিলেন চরের কাছে যে মাটি আছে তাতে আঁটি পুতে দেওয়া হলে গাছ বাঁচতে পারে। তারপর সে আঁটির অঙ্কুরোদগমের অপেক্ষা, তারপর সে

গাছে পচা সার দিলে, এমন জলজ জায়গায় গাছ বাঁচানো যেতে পারে। সেই সব পচা সার সংগ্রহের জন্য দাদু বছরের পর বছর সব পাতা ডাল কেটে দিনের পর দিন সঞ্চয় করেছেন—এবং প্রায় গল্পগাথার মতো হয়ে আছে এই তালগাছের জীবন ধারণ। একজন মানুষ আর প্রকৃতির যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রথমে গাঁয়ের মানুষেরা টের পেয়েছিল। তালগাছ বাঁচবে না, জল হাওয়া অনুরূপ নয়, তিনি বাঁচাবেনই। এভাবে এই বাড়িতে আছে সফেদা ফলের গাছ, লিচু গাছ এবং একটি অতীব মহার্ঘ ফলের গাছ যা তিনি বড় করে তুলে-ছিলেন আপ্রাণ চেষ্টায়—কমলালেবুর গাছ। গাছটি বেঁচেছে, ফলদান করে থাকে অজস্র, কিন্তু এত টক যে কেউ গাছের তলায় যেতে চায় না। ছোটদাদু প্রকৃতির কাছে এভাবে বারবার হেরেও আবার নতুন একটি আঙ্গুর লতার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সারা শীতকালটা এ গাছটাই তাঁকে ঠিক একজন যুবকের মতো বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি মাচান করে দিচ্ছিলেন, এবং খুব নিবিষ্ট, গাছের লতা তিনি বেশ জড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এবং বিকেল মরে আসছে। পদ্ম দরজায় দরজায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দেবে—নীল মাঠ থেকে গরু বাছুর নিয়ে আসছে। শীতের ঠাণ্ডা ক্রমে নিবিড় হচ্ছে আকাশে বাতাসে। তখন তিনি সহসা শুনতে পেলেন, পদ্ম তাঁকে ফিস ফিস করে কি বলছে!

দাদু বললেন, যা। চোখ তুলে মেয়েটাকে একবারও দেখলেন না! পদ্ম শাড়ি পরেছে দেখতে পেলে বুড়োর চোখেও তাক লেগে যেত। তিনি শুধু বললেন, সকাল সকাল চলে আসবি। নীলকে সঙ্গে নিয়ে যা।

পদ্ম বেশ ম্যানেজ করেছে তবে। পদ্ম বলেছিল, মিলির সঙ্গে যাচ্ছি। করিম চকিদার সঙ্গে থাকবে। দরগায় মোমবাতি জ্বালাব। দরগার নামে বুড়ো মানুষ না করতে পারে না। ধর্মটর্ম আছে, আস্তানা সাব ছিলেন বড় পীর। নানা রকম কিংবদন্তী আশেপাশে

সব ছড়িয়ে আছে। না বলে তিনি আর একটা বিপদ ডেকে আনতে কিছুতেই সাহস পান না।

পদ্ম বাড়ি থেকে নেমেই ডাকল, নীলদা।

নীল যতদূরেই যাক বাতাসে শুনতে পায় পদ্ম ডাকছে। যেন এক আশ্চর্য স্বর বাতাসে ভেসে আসছে। নীলদা ডাকলেই সে ভেতরে কেমন মূহ্যমান হয়ে যায়। তার কোনো দুঃখ থাকে না। সে বেঁচে আছে বড় সুখে বেঁচে আছে। স্বপ্নময় মনে হয় সব কিছু। আকাশে শীতের জ্যোৎস্না। গাছপাতার ফাঁকে বৃষ্টিপাতের মত মনে হয় জ্যোৎস্না আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পদ্ম সাদা গরদ পরেছে। শাড়ি পরে পদ্ম ভালভাবে হাঁটতে পারছে না। একটা পেতলের থালাতে দুটো মোমবাতি। প্রায় আলগোছে সে থালা হাতে কিছুটা দূরে পূজারিণীর মতো যাচ্ছে। চোখে-মুখে গাছপাতার মতো সজীব পবিত্রতা। গাঁয়ের কেউ দেখলে বলেছে—দরগায় যাচ্ছি। দরগায় মানুষ কেন যায়, সবাই জানে। রোগে, শোকে জরায় মানুষের কোনো অবলম্বন না থাকলে দরগার মাজারে যায়। বড় বিশ্বাস এই লৌকিক দেবতাকে। তারা হাত তুলে তখন দরগার পীরকে নিজের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তুমি আছ ফকিরসাব আমাদের আর ভয় কি।

পদ্ম বলল, দাদুকে বলেছি করিম যাচ্ছে। ঘোড়াটা থাকছে সঙ্গে।

নীলের মনে হল, মিলিকে সঙ্গে নিতে পারলে ভাল হত। গ্রামের শেষে, খানাখন্দ পার হয়ে তেঁতুলের বাগান পার হয়ে ছোট মতো একটা টিলা পার হয়ে যেতে হয়। তারপর সেই রাস্তা। অন্তহীন রাস্তার মতো সেটা পীরের দরগায় ঢুকে গেছে। দরগা শেষ হলে কবরখানা। মৃত সব মানুষেরা শুয়ে থাকে। তাদের হাড় কঙ্কাল কখন-সখনও মাটির ওপরে ভেসে উঠলে ভয়। ভয়ের কথা মনে হলেই পদ্ম ফকিরসাবের কাছে স্মরণ নিতে চায়। তিনি যখন আছেন

তখন সে আর তেমন ভয় পায় না। কেমন একটা নির্ভরতা এই ফকিরসাবের ওপর তার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। নীলদাকে নিয়েই যত ঝামেলা। ওরা নিরিবিলি যখন গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, লণ্ঠনের আলো আর চোখে পড়ছে না, নিশুতি রাতের মতো নিঝুম গাছপালা, সব মাথার ওপর শীতে শক্ত হয়ে আছে তখন পদ্ম বলল, নীলদা, এস মোমবাতি জ্বেলে নি এ ভাবে ওরা দুজন দুটো মোমবাতি জ্বেলে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমে গাছপালা ঘন গভীর হয়ে উঠছে দুপাশে। মালা-তাবিজ পরে যদি সেই বোড়া মানুষটি যে মাঝে মাঝে মুসকিল।শানের লম্ফ নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বের হয়ে যায়, যে একা মানুষ, দরগার পাশে মাচনের মতো করে থাকে, কালো আলখাল্লা গায়, লম্বা সাদা দাড়ি, চুল সাদা, এবং এক নিবাস গড়ে তুলেছে এই বন-জঙ্গলের ভেতর—সে থাকলে অকপটে হাঁটুমুড়ে মাজাবে ওরা চুপচাপ বসে থাকতে পারবে তারপর প্রায় দুই তরুণ-তরুণী দেখবে ক্রমশ মোমবাতি পুড়ছে, ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে, পুড়তে পুড়তে একেবারে যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন উঠে পড়ায় নিয়ম। মোমবাতি যতক্ষণ জ্বলবে—এক এক করে তখন সব প্রার্থনা জানাতে হবে, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা, তোমার কি দুঃখ, তোমার সুখের জন্য পৃথিবীতে আর কি কি চাই সব এক এক করে বলে যেতে হবে আস্তানা সাবের মাজারে। দু হাঁটু মুড়ে এই যে বসে থাকা, যেন নিরবধিকাল এভাবে বসে থাকা। মানুষের কিছু চাই। আস্তানা সাব তখন অন্তরীক্ষে—সব দেখতে পান তিনি এমন দুজন বালক-বালিকা নির্ভয়ে তাঁর মাজারে বসে প্রার্থনা করার জন্য আসছে—তিনি তাদের জন্য ভাল কিছু না করে থাকতে পারবেন না।

ওরা দুজন বেশ ধীরে ধীরে, পদ্মর দু হাতে মোমবাতি ধরা, নীলের দু হাতে মোমবাতি, ওরা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে—কোথাও পৃথিবীর তখন যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও তখন মহামারীরর মতো দুর্ভিক্ষ, আর

মানুষের অন্তহীন যাত্রা, মানুষ এভাবে ক্রমে এগিয়ে যায়—পদ্ম শুনতে পেল তখন গাছের নিচে অন্ধকারে কেউ ডাকছে তাদের—এই যে, নীল-পদ্ম। যেন ফকিরসাব বলছেন, জলাশয়ে নীলপদ্ম ফুটছে।

পদ্ম বলল, আমি পদ্ম ফকিরসাব।

নীল বলল, আমি নীল ফকিরসাব।

মালা-তাবিজ-পরা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফকিরসাব তাদের দেখে এগিয়ে এলেন—বললেন মোমবাতি জ্বলছে।

পদ্ম বলল, জ্বলছে।

ফকিরসাব হেসে বললেন, আসলে নীলপদ্ম ফুটছে।

নীল বলল, আমরা আস্তানা সাবের মাজারে যাচ্ছি ফকিরসাব।

তিনি বললেন, যাও কোনো ভয় নেই। মাচানে আমি আছি।

ওরা দুজন এভাবে নির্ভয়ে এবার এগিয়ে যেতে থাকল। নীল পরেছে লম্বা সোয়েটার, পাজামা। পা খালি। পদ্মরও পা খালি। ঘাস-পাতার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা। ওরা মাজারে দেখতে পেল, সুন্দর প্রাচীন উর্দু হরফে কি সব সোনালী জলে লেখা। কত সব রকমারী পাথর লাল নীল সবুজ কাঁচে মোড়া। মোমের আলোতে সারাটা মাজার, পাশের গাছপালা আর এই দুই বালক-বালিকা—ঠিক বালক-বালিকা বলা চলে না, যেন ওরা পৃথিবীর সব গোপনতম রহস্য জানতে আস্তানাসাবের দরগায় চলে আসছে। আসলে এই মানুষের দুই অপোগণ্ড ভেতরে ভেতরে বড় হযে যাচ্ছে, এবং শরীরের এ-সব ইচ্ছেরা যখন বড় হয়ে যায়, তখন যাবতীয় সুষমা শরীরে দিয়ে দেন ঈশ্বর। ওদের এখন বড় হবার বয়স। মাচানে ফকিরসাব চোখ বুজে মুসকিলাশানের আলোর সামনে বসে আছেন। দূর থেকে তার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।—যাবার সময় কৌটা নিয়ে যাস নীলপদ্ম।

পদ্ম বলল, আস্তনাসাবের কাছে কি চাইবে নীলদা ?

—কি চাইব। মান্নুদা ভাল হয়ে উঠুক চাইব। তুই ?

—আমি যে কি চাই ?

—কেন কিছু চাইবি না ? তবে এলি কেন ?

—কেন যে এলাম জানি না।

—তোর কিছু চাইবার নেই পদ্ম। যেন পদ্ম তখন বলতে পারত—আমি যে একটা নীলপদ্ম চাই। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। সে তখন এক সরোবর দেখতে পায়। ফকিরসাবের কথা শুনে তার মনে হয় সত্যি তবে সরোবরে নীলপদ্ম ফুটেছে। সে কেমন সহসা বলে ফেলল—তুমি বড় হয়ে আমাকে একটা নীলপদ্ম এনে দেবে ?

কি যে সব বলছে পদ্ম সে বুঝতে পারছে না। পদ্ম হাঁটু গেড়ে বসেছে। মাজারে মোমবাতি বসিয়ে দিচ্ছে। সেও মাজারে মোমবাতি বসিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। পদ্মকে এখন চেনা যায় না। সে যেন এক দূরের দেশে চলে গেছে। অনেক দূর দেশ থেকে তার কথাবার্তা সে যেন শুনতে পাচ্ছে। আসলে পদ্ম কিছু বলছে না, কেউ তার ভেতরে ভর করে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। ওর পদ্মর নির্লিপ্ত মুখ দেখে ভয় ধরে গেল। সে বলল, এই পদ্ম তুই কি আজে-বাজে বকছিস ! আমার কিন্তু ভয় করছে।

পদ্মর তাতে কিছু এল গেল না। সে তেমনি মাজারে মাথা নুইয়ে রেখেছে। ওর দু বেণী দু পাশে। দুহাত ছড়ানো মাজারে। পদ্ম না তাকিয়েই বলল, নীলদা তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না। তুমি বাড়ি চলে যাও।

নীল বলল, আর তো একটা বছর, তারপর পরীক্ষা। দেখবি আমি খুব ভালভাবে পাশ করব। আমার তখন আর কোনো কষ্ট থাকবে না।

কেমন শোকার্ত রমণীর মতো পদ্ম মাথা রেখেছে মাজারে!

মোমবাতি তেমনি জ্বলছে। গাছের পাতা পড়ছে দুটো-একটা। বনের ভেতর সব নানারকম কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। শেয়ালেরা হাঁকছে দূরে। মাচানে বনের গভীরে বসে আছেন সেই রক্ষণাবেক্ষণকারী মাসকিলাশানের মানুষটা। ওখানে মাঝে মাঝে দপদপ করে আগুন জ্বলছে। পদ্ম কেবল তাকিয়ে আছে নীলের দিকে। পদ্ম কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

তখন সেই ফকিরসাব হাঁক দিলেন, আশ্চর্য সেই হাঁক। নীলপদ্ম ফুটছে।

নীল ডাকল, এই পদ্ম।

পদ্ম বলল, হুঁ।

—তুই এ-ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?

—তোমাকে দেখছি নীলদা।

—আমার কি দেখছিস?

—ঠিক জানি না।

আবার হাঁক, ফকিরসাব ডাকলেন, নীল ফোঁটা নিয়ে যাস। একটা পয়সা দিবি। নীলপদ্ম ফুটছে।

ক্রমে মোমবাতি শেষ হয়ে আসে। আবার গাছের মাথায় সেই জ্যোৎস্না বৃষ্টিপাতের মতো নেমে আসে নিচে। আলো নিভে গেলে ওরা মাজার থেকে উঠে এল। কিন্তু কেমন রহস্যময় পথ, জ্যোৎস্না, পাখিদের কলরব কোথাও এবং অস্পষ্ট কুয়াশার মতো সাদা জ্যোৎস্নায় ওরা বনের গভীরে ঠিক পথ চিনে এগুতো পারছিল না। নীলের হাত ধরে গা ঘেঁষে কেমন এই সব অপরূপ বনভূমির ভেতর পদ্মর হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নীল পদ্মের শরীরে তখন ফুল ফোটার গন্ধ পাচ্ছিল।

তখনই আবার ফকিরসাব হাঁকলেন, নীলপদ্ম ফুটছে।

ওরা এবার মাচানের আলো দেখে বের হবার পথ খুঁজে পেল। এবং ফকিরসাব যেন একটা নতুন শব্দ, যেমন ওরা জানত না, পদ্ম

এবং নীল মিলে গেলে নীলপদ্ম হয়ে যায়। ফকিরসাব কত সহজে বলে ফেললেন, নীলপদ্ম ফুটছে। পদ্ম নীলকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ফকিরসাব কি বলছে! পদ্ম তারপর বনভূমির ভেতর কথাটার গোপন অর্থ বুঝতে পেরে নীলের হাত ধরে ছুটতে থাকল।—নীলদা ফোঁটা নেবে না! ফকিরসাবের মাচানের নিচে হাঁটু গেড়ে বসল। ফোঁটা নিল মুসকিলাশানের। তারপর দৌড়ে মাঠে নেমে গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকল নীলপদ্ম।

॥ এগার ॥

দেখতে দেখতে আবার নীলের পৃথিবীতে বর্ষাকাল চলে এল। চৈত্রের খাঁখাঁ রদ্দুর, বৈশাখের ঝড় বাতাস কাটিয়ে সব মেঘেরা এল ধেয়ে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম ঘন বর্ষন আরম্ভ হয়ে গেল ' সব ভিজে উঠেছে। গাছ পালা মাটি। সবুজ হয়ে গেছে দিক চক্রবাল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজের সমারোহ। দাদুর জ্বর হয়েছে। শুয়ে আছেন তিনি। পায়ের কাছে বসে নীল দুলে দুলে বিদ্যাভ্যাস করছে। ঘণ বৃষ্টি মাথায় সে গিয়েছিল সকালে মিলির বাবার কাছে। দাদুর জ্বর। কাসি। উঠতে পারছে না। কবিরাজ ছাতা মাথায় দেখে গেছে। অষুধ দিয়েছে। তিন গণ্ডা বড়ি স্বর্ণ সিন্দুর চার পরিয়া। বাসক পাতা, শেফালী পাতা, আনারসের কচি ডিগ তুলে রেখেছে নীল। দাদু এ বাড়ির প্রাচীন বৃক্ষের মতো। সে একটা নবীন বৃক্ষ বুঝতে পারে। সব কিছুর দায় এসে পড়ছে অযাচিত ভাবে তার ওপর। পদ্ম রস ছেঁচে দিয়েছে। দিদিমা বড়ি মেড়ে দিয়েছে। নীল জল কাদায় ঘরে ঢুকে বলেছে, ছোটদাদু অষুধ। ফুলু মাসির কফ্ কাসিতে খুব ঘেন্না। এ-ঘরে আসতেই চায় না। সে বলল, দাদু আপনাব অষুধ। উঠোন। ধরব?

—তুই কেন আবার এ-সব করতে যাস। পড়াশোনা করছিস না। বড় হবি কি করে, খাবি কি করে!

নীল কিছু বলল না। পায়ের নিচে ওর খাতা বই। দাত্নর অষুধ খাওয়া হয়ে গেলেই সে আবার পড়তে বসবে।

—ধরব? বলে নীল অষুধ জল মেঝেতে রেখে দু হাতে দাত্নকে তুলে ধরল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে রামায়ণের সেই ভীষ্ম চরিত্রটির মতো কেন জানি দাত্নকে ভেবে ফেলে। লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। এক মাথা ঘণ সাদা চুল। খোচা খোচা দাড়ি। শীর্ণ হাত পা। এবং বুকে ঘড় ঘড় শব্দ। আর বাইরে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া। এবং সব গাছগুলো মিলে যেমন, সেই তাল গাছ, বাতাবি লেবু, আম জাম, সফেদা ফলের গাছ আঙ্গুর লতার ভেতর একজন মহিমময় মানুষকেই সে অনুভব করতে পারে।

তারপর অষুধ খেলে ফের শুইয়ে দিল নীল।

দাত্ন বললেন, নীল তোর স্কুল কবে খুলবে?

নীল বলল, বিশে জৈষ্ঠ

—আজ কত তারিখরে!

—দু তারিখ।

—তা হলে দেখছি তোর স্কুল খোলার আগেই আমি চলে যাব!

নীল বলল, হ্যাঁ চলে গেলেই হল।

—তোর রাঙ্গামামাকে ন'মামাকে চিঠি লিখে দে।

—কি লিখব।

—আসতে লিখে দিবি।

আসলে নীল বুঝতে পারে এ-বাড়িতে কি করে এই বুড়োমানুষটার সে একমাত্র অবলম্বন হয়ে গেছে। মার জন্য বুড়ো মানুষটার খুব ভাবনা।

—বড় হয়ে কিন্তু মাকে সুখে রাখবি।

নীল এ-সব কথার অর্থ ঠিক ঠিক ধরতে পারে না। সে বলল, তুমি কাল থেকেই দাত্ন ভীষণ প্যাচাল পারছ। চুপ কর না।

—ও আচ্ছা। তোর পড়ার ক্ষতি হচ্ছে!

নীল বলল স্কুল খুললেই তো পরীক্ষা।

—তা হলে আর সময় নষ্ট করিস না। কটা দিন খুব পড়ে নে।

তারপর বুড়ো মানুষটা বলল, এ-সময় না মরলেই চলত। কিন্তু কি করে বুঝব বল, বর্ষা ভাল করে আসতে না আসতেই চলে যেতে হবে আমাকে।

নীল বলল, আচ্ছা আপনি কি আবল তাবল বকছেন বলুনতো।

বুড়ো মানুষটা তখন কেমন ক্ষিন গলায় বলল, মন খারাপ হচ্ছে খুব। বুঝতে পারি।

নীল বলল, চুপচাপ শুয়ে থাকুন। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে দেব!

— আমি সব বুঝি। পদ্ম তোকে খুব ভালবাসে নারে!

নীলের বুকটা কেমন খচ করে কামড়ে ধরল।

—পদ্ম বড় ভাল মেয়ে। সারাজীবন মেয়েটা দুঃখ পাবে।

নীল বলল, দাদু আপনি চুপ করবেন না বই খাতা সব তুলে রাখব।

ছোট দাদু আর একটা কথা বললেন না। নীল কাঁথাটা ভাল করে শরীরে জড়িয়ে দিল। তারপর ঐকিক নিয়মের কিছু অংক পর পর করে গেল। একটা অংকের গড় হিসেব কিছুতেই মিলছে না। মেজ-দিদিমা মুখ বাড়িয়ে ভিজতে ভিজতে একবার বলে গেল, জ্বর দেখেছিস নীল!

—মনে হয় জ্বর আছে।

এ-ঘরে আজকাল কেউ বড় আসেই না। নীলই ঘরটা পরিষ্কার করে রাখে। ছোট দাদু আর তার ঘর এটা হয়ে গেছে। মাসে দু একবার দিদিমা ঘরটা লেপে দিয়ে যায়। পদ্ম মাঝে মাঝে চুপি চুপি ঢুকে পড়ে। নীলের বই খাতা পেনসিল সব ঠিকঠাক করে রেখে দেয়। মামুদা আজকাল আর আগের মতো হঠাৎ উধাও হয়ে যায় না। আবার আগের মতো মামীমার কথাবার্তা শুনছে। পদ্ম দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল। চারপাশে সন্তর্পণে

দেখছে। এই বৃষ্টির ভেতর নীলদার ঘরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে। সে বলল, মা দাদুর বার্লি হয়েছে ?

বার্লিটুকু আর এক গ্লাস জল নিয়ে সে নীলদার ঘরে যাবার সুযোগ পাবে। সেই আশায় বসে আছে। নীলদা কি করছে। নীলদার কত কাজ পড়াশোনা হয়ে গেলেই গরুগুলো ছাড়া বাড়িতে বেঁধে দিয়ে আসতে হবে, তারপর নীলদার হাতে কোনো কাজ না থাকলে মা একটা না একটা কাজ দিয়ে দেবে, যেমন গাছপালা থেকে বড় বড় ডাল কেটে ফেলা, ডালগুলো শুকোলে ছোট ছোট করে কাটা, আঁটি বাধা সব কাজই নীলদা করবে। দাদা সাক্ষী গোপালের মতো সঙ্গে থাকবে শুধু। এখন এই বর্ষায় মা নীলদাকে কি বলবে বুঝতে পারছে না। বার্লি নিয়ে যখন গেল, হয়তো দেখবে আসল মানুষটাই ঘরে নেই। ঘরে না থাকলেও সে যতটা পারে নীলদার বই খাতাপত্র, জামা প্যাণ্ট, সুটকেসের মধ্যে সময় কাটিয়ে দেয়। আর বার বারই কিছু লিখে রাখতে ইচ্ছে করে। মুখেতো সব কথা বলা যায় না। সে দুবার গোপনে ওর ইংরেজি খাতায় কিছু লিখেও ফেলেছিল। তারপর কেমন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। মার মুখ, বাবার রুষ্টতা, এবং ফুলুমাসির হুল ফোটানো কথাবার্তার কথা মনে হলেই কিছু আর পারে না। সে কেটে দেয়। মুছে দেয়। তারপর পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে কোথায় যে লুকিয়ে রাখবে বুঝতে পারে না।

নীলদার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে। দাদুর ক'দিন থেকে জ্বর। গতকাল থেকে প্রবল কাসি। কবিরাজ কাকা দেখে গেছে সকালে। তখন সবাই ঘরে গিয়েছিল একবার। দাদু হা করে জিভ দেখিয়েছে। কবিরাজ কাকা চোখ টেনে দেখেছে। বয়স কত হল একবার জিজ্ঞেস করেছে। তারপর নীলদার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আয়, অষুধ দিচ্ছি। আর কিছু বলেনি।

নীল তখনই শুনল, দাদু আবার বলছে, কিরে চিঠিগুলো লিখলি ?

—লিখব।

—লেখা এখনও হল না।

নীল বলল, আবার আপনি প্যাচাল পাড়ছেন।

—অঃ মনে থাকে না।

নীল বই খুলে মাত্র পড়বে, আকবর ওয়াজ এ গ্রেট এমপারার তখনই আবার দাদু বললেন, আমি না থাকলে, কোনোরকমে আর একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারবি না !

নীল বলল, পারব।

—ওদের বলে যাব, তোর পড়ার খরচ দিতে। তুমি এখন মন দিয়ে পড়। আমার জন্য ভাবতে হবে না।

—পড়তে দিচ্ছেন কোথায় !

আবার ছোট দাদু চুপ মেরে গেলেন। দু তিনটে বড় আকারের মাছি মুখে বসেছে। দুর্বলতার জন্য হাত নাড়তে পারছেন না ভালভাবে। নীল লক্ষ্য রাখছে। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে মাছিগুলো। একটা মালসা আছে নিচে। ওটাতে কফ থু থু ফেলছেন। কাসি উঠলেই সে কাছে ওটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

—দাঁড়িয়ে থাকলে হবে, পড়বি না।

নীলের কেমন ভাল লাগছিল না। দাদু কেমন অবুঝ হয়ে উঠছে। সে বলল, কবিরাজ মামা এলে বলে দেব। আপনি কেবল কথা বলেন।

—নীল তুই আমার হয়ে চিঠিগুলো লিখে দেনা ভাই। তোর মাকে লিখে দে আগে। ও চলে আসুক। তুই ছেলেমানুষ পারবি না।

—কি লিখব।

—লিখবি, আমার সময় হয়ে গেছে। বুড়ো হয়েছি, শোক তাপ

করতে বারণ করে দিবি। পত্র পাঠ যেন তোর মা চলে আসে। আর তোর মামাদের লিখবি, আমি তোর স্কুল খোলার আগেই চলে যাব। যদি দেখার ইচ্ছে হয় যেন আসে। ছেলেদের ওপর বড় অভিমান তার। একবার এসে বুড়ো বাপকে দেখেও যায় না।

নীলের বুক বেয়ে কেমন একটা চাপা কান্না উঠে আসে। এই ঘরটায় সেই কবে থেকে সে, সুধন্য আর দাদু আছে। সুধন্য চলে যাওয়ায়, সে আর দাদু। দাদু চলে গেলে সে একা। এত বড় ঘরটায় সে একা থাকবে কি করে বুঝতে পারছে না। সে বলল, দাদু একা থাকব কি করে। আপনি যাবেন বললেই হল!

—সুধন্যকে লিখে দে চলে আসতে। ওদের কিছু বলবি না। একটা কথাও বলবি না। তোর রাঙ্গা মামাকে আমার হয়ে লিখে দে, যা যা বলছি লিখে দে। কি লিখছিস। একবছরের মতো তোর আর সুধন্যর খরচ···

নীল বলল, হ্যাঁ লিখছি।

—আজই পোস্ট করে দিস।

—দেব।

—কেউ জানবে না, বলবি না বল!

—না বলব না।

—সব স্বার্থপর। পদ্মকে ডাক না, পদ্মকে দেখি।

নীল মুখ বাড়িয়ে ডাকল, পদ্ম দাদু তোকে ডাকছে।

পদ্ম বলল, বার্লি নিয়ে যাচ্ছি।

পদ্ম এলে বুড়োমানুষটা বলল, কি দিদি কেমন মনে হচ্ছে!

পদ্ম বুঝতে না পেরে নীলের দিকে তাকাল। নীল সন্তর্পনে একটু ওদিকে ডেকে নিয়ে বলল, দাদু বলছে, আমার স্কুল খোলার আগেই মরে যাবে।

পদ্ম বলল, আপনি মরে যাবেন কে বলেছে?

—আমি টের পাইনা বুঝি। তোর ছোট ঠাকুমা কালতো দেখা করে গেল।

পদ্মর এই দোষ। দাদু মরে যাবে শুনেই টস টস করে চোখের জল পড়তে থাকল।

নীল বলল, আমরা আস্তানাসাবের দরগায় যাব। আবার মোমবাতি জ্বালব। আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

—চিঠিগুলো পাঠালি!

পদ্ম আবার তাকাল। নীল সব খুলে বললে, পদ্ম বলল, উঠুন, বার্লি খান।

নীল এবং পদ্ম দু'জনে ধরাধরি করে বসাল। মানুষ বুড়ো হলে সবাই কেমন অবহেলায় ফেলে রাখে। দাদু যে এত দুর্বল হয়ে গেছে পদ্ম এই প্রথম টের পেল। কাল বিকেলেও দাদু বিছানা থেকে নেমে জলচৌকিতে বসেছিলেন, একটু তামাক সাজিয়ে দিয়েছিল নীলদা, খেয়েছিলেন, আজ কেমন সত্যি মনে হল চোখ ঘোলাটে, দুর্বল, মাছিগুলো বেশি জ্বালাতন করছে।

পদ্ম বলল, আমি আর নীলদা মিলে সব চিঠি লিখে ফেলছি।

বুড়োমানুষটা বলল, আর কাউকে বলিস না, তোরা চিঠি লিখে দে। পদ্ম তোর মা ভাল না। খুব স্বার্থপর।

নীল বলল, কি যা খুশি বকে যাচ্ছেন।

বুড়ো মানুষটা বলল, মরে যাবার আগেও তোরা দুটো একটা সত্যি কথা বলতে দিবি না নীল। এতদিন কিছু বলিনি। পদ্ম তোর মাকে কিছু বলছি বলে রাগ করছিসনাতো দিদি।

—রাগ করব না! বারে, আমার মাকে বলবেন, আমি বুঝি রাগ করব না?

—ঠিক আছে, তবে আর কোনো সত্যি কথা বলব না।

নীল কেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাদু আবার শুনতে

না পায় সে দরজার সামনে চলে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। পদ্মর আবার এক দোষ, নীলদাকে কাঁদতে দেখে সেও ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। নীল বলল, দাদু সকাল থেকেই কি আজে বাজে বকছে।

পদ্ম বলল, এস চিঠিগুলো লিখে ফেলি।

নীল দাদুর বালিশের তলা থেকে কিছু রেজকি পয়সা বের করে চলে গেল খাম আনতে। গোপনে সে আর পদ্ম লিখে চলল এক এক করে সব চিঠি। দাদুর একটা খেরো খাতায় সব ঠিকানা লেখা। সেই ঠিকানায় সব চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিতে থাকল। দাদু যা যা বলেছে সব লিখে দিল চিঠিতে।

দুপুরে এসে মিলির বাবা অনেকক্ষণ বসে দাদুকে ফের দেখল।

দাদু বললেন, কি বুঝছ!

মিলির বাবা বলল, যাবেন না।

দাদু হেসে বললেন, আর আটকাতে পারবে না।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মেজমামী, দিদিমা, মানুদা সবাই। কেবল ফুলুমাসি দরজায় দাঁড়িয়ে। অসুস্থ শুনে বিকেলের দিকে কেউ কেউ এসেছে। ওরাও পাশে দাঁড়িয়েছিল।

মেজমামী কবিরাজ মামাকে উঠোনে ডেকে বলল, কেমন দেখলেন।

—বেশ দুর্বল। একবেলা দুধ বার্লি মিলিয়ে দিন।

—ভয় টয়ের কিছু নেইত!

—না। ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে।

নীল বলে ফেলতে গেছিল, স্কুল খোলার আগেই দাদু বলেছে চলে যাবে। কিন্তু দাদু আবার বলেছে, কাউকে বলবে না। নীল বলতে পারল না। পদ্মও দাদুকে কথা দিয়েছে, সে বলতেই পারল না, সবাইকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে, দাদু স্কুল খোলার আগেই চলে যাবে বলেছে।

সাদাখামে সব চিঠিগুলো লুকিয়ে পদ্ম ফেলে এল মিলিদের ডাক-

বাকসে। নীল-ডাকবাকসটা একজন মানুষের চলে যাওয়ার খবরগুলো কেমন গিলে ফেলল। পদ্ম চিঠিগুলো ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ ডাক-বাকসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। সত্যি তবে দাদু চলে যাচ্ছে। এবং যখন চলে যাবেন তখন কাছে দাঁড়িয়ে ঠিক ঠিক কেমন দেখাবে যাওয়াটা চোখ বুঝে টের পেতে চাইল। মিলি নেই। থাকলে সে ওর সঙ্গে আজকের দিনে কথা না বলে পারত না।

আর এ-ভাবেই কেমন এক প্রিয়জনের মুখ দেখে ফেলে। নীলদা বুড়ো হলে মুখটা না জানি কি রকম দেখাবে। অথবা শৈশবে দাদু দেখতে নীলদার মতোই ছিল বুঝি। এবং একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যু ভাবনায় সে কেমন মুষড়ে পড়ল। বাড়ি ফিরে নীলদাকে সে খুঁজল। নীলদা স্নান করতে গেছে। স্নান করে ঠাকুব ঘরে ঢুকবে। ঠাকুর পূজা হলে একটু চরণামৃত দাদুর কপালে ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিতে হবে। এগুলো সংসারে খুব দামী ব্যাপার মনে হয় পদ্মব।

এবং নীল যখন নিবিষ্ট মনে পূজো করছিল, পদ্ম দবজায় হেলান দিয়ে দেখছে। নীলদাকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয় না। সামান্য গোঁফের বেখা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমন সুন্দর নিবিষ্ট মুখ যেন জীবনেও দেখেনি। অপলক সে নীলকে কেবল দেখে যাচ্ছিল। পাশের ঘরেই দাদু লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। ঘণ্টা নাডার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পূজো শেষ হলে নীলদা শংখে ফু দেবে জোরে। দাদুর তসরের কাপড় সে পরে নিয়েছে। যেন এ-ভাবেই বুড়ো মানুষটা শৈশবে মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত পূজো আর্চা করত। হুবহু দাদুর মতোই নীলদা চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটা বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

পূজো হলে নীল বলেছিল, দিয়ে এলি পদ্ম।

পদ্ম বিমূঢ়। মলিন মুখ। চোখ বড় বড়। চুল এসে উড়ে কপালে পড়েছে। এক আশ্চর্য সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াচ্ছিল পদ্মর মুখে।

নীল কোষা দিয়ে সামান্য চরনামৃত ছোট সাদা পাথরের বাটিতে রেখে দিল। কাশর বাজাল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট শিশুরা ছুটে এল। সে চাল কলা মেখে বিলিয়ে দিতে থাকল সব শিশুদের। এবং বিকেলেই অবস্থা দাদুর ক্রমে খারাপের দিকে যেতে থাকল।

আর পাঁচ সাতদিনের ভেতরই বাড়িতে সব আত্মীয় কুটুমে ভরে যেতে থাকল। একজন বুড়োমানুষ চলে যাচ্ছেন খবর পেয়েই সবাই এসেছে। মেজমামী অবাক। ওরা এতটা ভাবেই নি। যেন সময় মতো সবাই চলে এসেছে। গতকালও অবস্থা খারাপ ছিল না। বাড়িতে এত আত্মীয় কুটুম কতদিন হয়নি। সাগর, খুশি, বড় মামার বৌ, ছোটমামা, ন'মামা, বাঙ্গা মামা এবং হামচাদি, গোপালদী থেকেও চলে এল সব আত্মীয় স্বজন। একজন বুড়ো মানুষ বোঝাই যাচ্ছিল সগৌরবে মারা যাচ্ছেন। তাদের থাকবার খাবার এবং শোবার বন্দোবস্ত করতেই মেজ মামীর প্রানান্ত। দাদুর ঘরে আসতেই পারছে না। মেজ-মামীকে নীলের আর এতটুকু খারাপ লাগছিল না। কিছুটা উৎসবের মতোই ব্যাপার যেন।

ক'দিন কেবল বাড়িতে দাদুর জীবন গাথা নিয়ে আলোচনা হতে থাকল। এবং সব শুনে মনে হল, মানুষটা সারাজীবন তার দুঃখ কষ্টের ভেতর এই শেষ বয়সে এসে পৌঁছেছেন। কঠিন কঠিন শোক পেয়েছেন। ছোট দাদুর মেয়ে খুব অল্পবয়সে সান্নিপাতিক জ্বরে মারা গেছে। এক ছেলে দু বছর বয়সে জলে ডুবে মরেছে। এক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে শ্বশুরালয়ে। স্ত্রী, সন্তান হবার সময় মারা যায়। এতগুলো মৃত্যু চোখের ওপর প্রত্যক্ষ করেছেন। অথচ নীল এতদিন একসঙ্গে থেকেও কোন শোকের কিংবা দুঃখের খবর পায়নি। মানুষটা যত বিছানার সঙ্গে মিলে যেতে থাকল তত নীল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। একজন মানুষের জীবন পৃথিবীতে বুঝি এ-ভাবেই শেষ হয়ে যায়। তার দুঃখ শোক হতাশার খবর কেউ রাখে না।

স্কুল খোলার আগের দিন ছোট দাছ্ সবাইকে কাছে ডাকলেন। বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও।

মা বড় বড় বালিশে হেলান দেবার ব্যবস্থা করে দিল।

মা আসাতক এ-ঘব থেকে বেরই হয়নি। মার মাথায় হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দাছ্ কি সব বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। মাকে পেয়ে বুড়ো মানুষটা যেন বড় রকমের একটা অবলম্বন পেয়ে গেছিল। মাও ঘর ছেড়ে বের হয়না। মার খাবার এ-ঘরেই চলে আসে। দাছ্ সবাইকে ডেকে বললেন, খাওয়া নাওয়া সেরে নাও। তোমরা একটু সবাই তাড়াতাড়ি করবে। সময় কিছুতেই আর তিনি দিতে চাইছেন না। দাছুর কথামতো সবাই যে যাব খাবার তাড়াতাড়ি ছুটো খেয়ে চলে এল। কেবল মা কিছু খেল না। এবং সবাই যখন উপস্থিত, তিনি হাত ছুটো বুকের কাছে নিয়ে এলেন। হা করলেন। পাণ্ডুব শীর্ণ মুখে সামান্য চরণামৃত দিতেই চোখ বুজে ফেললেন। ধরাধ'র করে বাইরে নিয়ে আসা হল। এবং একটা সাদা চাদবে সবটা ঢেকে দেওয়া হল।

নীল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করল। আজন্ম এই মানুষটা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় বেখে গেছে তাদের সামনে।

খুব কান্নাকাটি কিছু হল না। পদ্ম কিছুক্ষণ পায়ের কাছে বসে কাঁদল। মা পায়ের কাছেই মাথা বেখে পড়ে থাকল। মামারা পাশের ছাড়াবাড়িতে দাহের ব্যবস্থায় খুবই ব্যস্ত। মানুষজন যে যেখানে ছিল গাঁয়ের চলে এসেছে। শেষ বারেব মতো গ্রামের বুড়ো ঠাকুরকে দেখতে এসেছে তারা।

এই প্রথম নীল একেবারেই কাঁদতে পারল না।

কেমন একটা শূন্যতা বুকের ওপর ভার হয়ে চেপে বসে থাকল। সে সারাবিকেল মামাদের সঙ্গে কাঠ বয়ে নিল ছাড়াবাড়িতে। আগুন দিল। এক ফোঁটা জল তবু চোখ থেকে পড়ল না।

॥ বারো ॥

বাড়িটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল। আত্মীয় কুটুম সবাই চলে গেছে। মেজমামা ক'দিন থেকে গেল। জমিজমা দেখা শোনার জন্য সুধন্য আবার দেশ থেকে চলে এসেছে। দাদুর ঘরটায় সে আর সুধন্য থাকে। ক'রাত বেশ ভয় ভয় করেছে। মনে হয়েছে দাদু জানালায় এসে দাঁড়াবে। কখনও নিশীথে এসে সহসা তাকে ডাকতেও পারে।

দাদুর চিতায় একটা তুলসী মঞ্চ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় সে আর পদ্ম সেখানে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে। নীল প্রণাম করার সময় বলেছে, দাদু আমি ভাল হয়ে থাকব। রাতে বিরোতে ভয় দেখিও না।

পদ্ম বলত, দাদু বাবার মতি গতি ঠিক করে দাও। বাবা বাসা করে ফিরে এসে নিয়ে যাবে বলেছে। রাতে পদ্ম, বাবা মার সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে একদিন নীলকে বলল।

নীলের টেস্ট পরীক্ষার আগেই ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেল। মেজমামা বাবাকেও একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ভাল না। সময় থাকতে একটা কিছু করে ফেলা দরকার। তাতে দেশ ভাগটাগের কথাও লেখা আছে। বাবা নীলকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে। ঢাকায় বড় রকমের দাঙ্গা লেগেছে। মিলির কাকীমা চলে এসেছে গাঁয়ে। কেমন একটা অরাজকতা সর্বত্র।

মেজমামা আবার ফিরে এসেছিলেন, পুজোর ছুটি শেষ হয় হয় সময়টাতে। এবারে তিনি নীলের জন্য কোনো উড-পেনসিল অথবা হাতিমার্কা কাগজ নিয়ে আসেননি। কেমন খালি হাতে চলে এসেছেন। সুধন্য আর সে নৌকায় অলিপুরা গিয়েছিল। মেজমামা

গয়না নৌকায় হাটের শেষ বিকেলে এসে নেমেছেন। হাট থেকে বড় টাকা মাছ কিনলেন। জলকচু চারটা। করলা ঝিঙে ঝুড়ি বোঝাই তোলা হল নৌকায়। ছুটো বড়ো হলুদ রঙের আখ কিনে নিলেন। তারপর নৌকায় বসে আখ সঙ্গে দিলেন নীলকে। বললেন, খা।

কেমন ছেলেমানুষের মতো দাঁত দিয়ে আখ ছাড়াচ্ছিলেন। এ-দেশ ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে ভেবেই শৈশবের মতো শেষবার বুঝি প্রকৃতির ভেতর পড়ে বালক হয়ে গেছেন। নীলের দাঁত খুব ভাল না। আখ ছিড়তে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল। মেজমামা বললেন, কিরে আখ খেতে শিখিসনি। তারপর আখ ধরার এবং কামড় দেবার কায়দা থেকে ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত সবটাই দেখিয়ে বললেন, খাতো দেখি, পারিস কি না?

নীল মেজমামার মতো কায়দা করে আখে কামড় বসাল!

—উঁহো হচ্ছে না। বলে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। গিটে কামড় দিচ্ছিস .কন! একটু উপরে দে। টান! এইতো। দেখলি কত সহজ। মুখটা রসে ভরে গিয়েছিল নীলের। মেজমামা তখন সুধন্যর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। সুধন্য লগি মেরে নৌকা এগিয়ে নিচ্ছে। পাড়ার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বলছেন, আরে মজিদ ভাই না। ও ইদ্রিশ তোমার বাজানের খবর কি!

ওরা সবাই খুবই মান্য করে কথা বলছিল মেজমামাকে। কলকাতায় থাকলেই মানুষ এদেশে মান্যগন্য হয়ে যায়। তা ছাড়া ঠাকুরবাড়ির মেজকর্তা। সুতরাং সবাই যে যার মতো বলল, আছেনতো ক'দিন!

—না, নেই। বেশিদিন নেই।

পরদিন সকালবেলা নীল দেখল পদ্ম আর পড়তে বসেনি তক্ত-পোষে। কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেস্ট পরীক্ষা কাছে অথচ মেজমামার কত কাজ এবারে। সুধন্য একা পেরে উঠছে না। একে ওকে ডেকে আনা হচ্ছে।

কবিরাজ মামা এসে সকালে খানিকক্ষণ গল্প করে গেল। খুবই চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে সবাইকে। কোথায় কিভাবে শেষপর্যন্ত সব সামলানো যাবে বোঝা যাচ্ছে না। যদি সত্যি শেষপর্যন্ত গন্ধীজী মেনে নেন। একমাত্র তিনি দেশভাগের বিরুদ্ধে আছেন। কিন্তু এক এক করে যে-ভাবে দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ছে তাতে করে কলকাতাও খুব একটা নীরাপদ জায়গা বলে মনে হচ্ছে না। তবু মানে মানে সরে পড়াই ভাল। কবিরাজ মামা বলে গেল, দেখবেনতো ওদিকে কিছু জমিজমা সহ বাড়ি টারি পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু খুলে বললেও মনে মনে বেশ দোটানায় পড়ে গেছে মানুষটা, নীল কবিরাজমামাকে দেখেই এটা বুঝতে পারল।

নীল বড় মিঞা আবদুল রউফকে ডাকতে গিয়েছিল সনকান্দায়। রউফ এসে পড়লে বাইরের উঠোনে বসতে দেওয়া হল। মেজমামা তখন স্নান করতে যাবেন। রউফকে দেখেই বলল, তা বড় মিঞা আমিতো ছেলেপুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। ভাগের জমি আর রাখব না। বিক্রিবাট্টার ব্যবস্থা দেখ।

—সবাই চলে যাচ্ছেন!

—সবাই যাচ্ছে না। মা আর ফুলু থাকছে। সুধন্য আছে। নীলের পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাড়ি চলে যাবে। তারপর আবার ফিরে এসে কি করা যায় দেখব। টাকার খুব দরকার।

নীল তার ঘরে বসে সবই শুনতে পাচ্ছিল। ছোট দাদু কত কষ্ট করে এই বাড়িটা ফলে ফুলে ভরে রেখে গেছেন। কেমন শনির কোপে পড়ে গেছে মতো বাড়িটা। ছোট দাদু নেই, ফাঁকা ফাঁকা, যদি সত্যি পদ্ম চলে যায় তবে তার কি হবে! বুকে কেমন একটা ব্যথা গুড় গুড় করে বাজছে। পদ্মর মুখোমুখী হতেও ভয় পাচ্ছে। কাল বিকেল থেকেই পদ্মকে আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর খুট খাট এত কি যে করছে! পদ্ম কি তার সঙ্গে আর একটা

কথাও বলবে না। কেবল মেজমামী এ-বাড়িতে এখন সবচেয়ে ভাল মানুষ হয়ে গেছে।

মেজমামার জন্য দুধের পায়েশ হয়েছে। পুলিপিঠা হয়েছে। সবার হাতে দেবার সময় মেজ-মামী নীলকেও ডেকে দিয়েছে। মেজমামি কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে। আলতা পরেছে পায়ে। বিকেলেই মেজমামী কাচা শাড়ি পরেছে। মুখে গোপনে বোধ হয় পাউডারও মেখেছিল। কেমন একটা সুন্দর গন্ধ মেজমামীর গায়। এবং দিদিমা খুব যেন ভরসা পাচ্ছে না। বার বারই বলছে, তুই কবে আবার আসবি নবীন। ওদের সঙ্গে ফুলুটাকেও নিয়ে যা। আমার কপালে যা আছে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ফুলুমাসিও সঙ্গে যাবে।

সাঁজ লেগে যাচ্ছিল। নীল আর সুধন্য মিলে শুকনো কাঠ ঘরে তুলছে। মানুদা গেছে হাটে। দেশের যা কিছু ভাল, কলকাতায় যা পাওয়া যায় না, মানুদা বেছে বেছে সে-সব নিয়ে আসছে। যেমন আজ সকালে কাচ্কি মাছ এনেছে পুবপাড়ার বাজার থেকে। মেজমামা আগের মতো আর মানুদার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন না। বরং ছুটো একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাইছেন। ছেলেটার পড়াশোনা হল না শেষ পর্যন্ত। মেজমামা বললেন, আমাদের কোম্পানীর বড়বাবুকে বলে রেখেছি। বার্ডস কোম্পানীতে তোকে বলেছে ঢুকিয়ে দেবে। মাইনে পত্র ভালই। তেতাল্লিশ টাকা দশ আনা। কম না টাকাটা।

নীলের খুব শ্রদ্ধা বেড়ে গেল মানুদার ওপর। সে বলল, মানুদা চাকরি হলে আমাকে একটা কিন্তু কলম কিনে দেবে।

বিশ্বাসী মানুষ এই নীলটা। তাকে সে যেন এখন সব কিছুই দিতে পারে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছে কত বড় কথা! মানুদার সঙ্গে সে এখন আরও বেশি সমীহ করে কথা বলছে। ডলিদি এলে বলে দেবে, মানুদা আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার

মতো মানুষ না। মাইনে তেতাল্লিশ টাকা দশআনা। তবু থেকে থেকে কেমন একটা আশংকা, পদ্ম চলে যাবে, চলে গেলে এই বাড়িটাতে সে থাকবে কি করে! তার তো কেউ থাকবে না। ছোট দাদু না, পদ্ম না, তার ভেতরটা মাঝে মাঝে বড় আঁকু পাকু করছে। সে তখনই দেখল পদ্ম রান্নাঘরে যাচ্ছে বড় একটা থালা গ্লাস নিয়ে। মেজ মামী ডাকছে, পদ্মরে মা আয়। বেসনটা ফেটে দে মা। তোর পিসিকে বল, সুধন্যকে দিয়ে কেরোসিন তেল নিয়ে আসতে। ঘরে আলো জ্বেলে দিতে বল। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।
কেবল কি খেতে ভালবাসে মানুষটা এই নিয়ে দিদিমা আর মেজমামীর ভেতর প্রতিযোগিতা চলছে। দিদিমা বলল, নবীন আমার সিমের বিচি দিয়ে শুকতোনি খেতে ভালবাসে, বাড়িতে শিমের বিচি নেই, ফুলু মাসিকে পাঠিয়ে পালের মার কাছ থেকে একমুঠো সিমের বিচি চেয়ে এনেছে। নবীন আমার চিড়ের মুড়িঘণ্ট খেতে ভালবাসে। দারচিনি এলাচ ছিল না, টোকা থেকে পয়সা বের করে দিয়ে বলেছে, *যাতো নীল, সরকারের দোকান থেকে গরম মসলা নিয়ে আয়।* নবীন আমার খেতে ভালবাসে ফুলের বড়া। এক একদিন এক একরকম-ভাবে সব এখন আমিষ নিরামিষে পাল্লা চলেছে। নবীন আর একটু দেব। নবীন যদি বলে, না, তখন মনটা কেমন দমে যায় দিদিমার। মামা অগত্যা বলেন তখন, দাও একটু। খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। তুমি মাছ যে খেলে না! নীলের মনে হচ্ছিল মেজমামা বড়ই বিপাকে পড়ে গেছেন খেতে বসে। শাশুড়ি বউতে বড্ড বেশি মারামারি কাটা-কাটি চলছে। মেজমামা মাঝে মাঝে নীলের পাতে, মানু এবং পদ্মর পাতে তুলে দিচ্ছে। এবং নীল বুঝতে পারছে মামার এখন সেই সব চেয়ে উপকারী মানুষ। পরদিন সকালে কৃতজ্ঞতা স্বীকার হেতু আস্ত একটা রূপোর টাকা দিয়ে বলেছেন, তোর খুশি মতো খরচ করবি নীল।

মেজমামা টাকাটা দিয়েই বের হয়ে গেলেন। বাড়ি এলে গাঁয়ের

সবার সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা করেন। কথা বলেন গল্প করেন। কলকাতার গল্প গ্রামদেশের মানুষেরা শুনতে বড় ভালবাসে। নীল ইতিহাস পড়ছিল। পদ্ম আজও পড়তে বসেনি। মেজমামী পদ্ম পড়ছে না বলে কোন অশান্তি করছে না। পদ্ম যে কি করছে! পদ্মকে সে একবার হাসতেও দেখেনি। মেজমামা একবার বলেছিল, কিরে পদ্ম কি হয়েছে! কেউ তোকে বকেছে!

পদ্ম মেজমামার পাশ থেকে ইচ্ছে করেই চলে গেছিল। মিলি গত কাল বিকালে এসেছিল। ওরা দুজনে কুয়োতলায় কত কথা বলেছে। মিলিই বেশি বলেছে মনে হয়। কারণ সে মিলিকে খুব হাসতে দেখেছিল। যাবার সময় মিলি একবার সতর্ক চোখে কি দেখে গেল! পদ্ম অন্যদিন মিলিকে পুকুর পাড় এগিয়ে দিয়ে আসে। গতকাল সে মিলির সঙ্গে পেয়ারা গাছটা পর্যন্ত ও যায়নি। কুয়োতলায় সেই থেকে দাঁড়িয়ে ছিল। জলে সারাক্ষন মুখ দেখেছে। সে যে এতবার পাশ কাটিয়ে গেল পদ্ম বলল না, নীলদা তোমার খারাপ লাগছে না! আমি চলে গেলে তুমি কষ্ট পাবে না।

নীলের মনে হয়েছিল, কলকাতা এতবড় শহর, সেখানে সামান্য নীলের অভাব যেতে না যেতেই মুছে যাবে মন থেকে।

গোপন অপমানে, সেও কিছু তাকে বলতে পারেনি। গোপন অভিমান, না প্রকৃতির কুট খেলা কে জানে!

সন্ধ্যায় ছোটদাদুর সম্মানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ছম ছম করে। পদ্ম আগে যাচ্ছে। পেছনে নীল। চার পাশে সব গাছ গাছাগুলি, নিচে সরু পথ। মাথা নুয়ে এখানটায় ঢুকতে হয়। ভেতরে ঢুকে গেলে ছাড়াবাড়িটা বেশ গোপন একটা জায়গার মতো। মেজমামা আসার পর সে এখানটায় পদ্মর সঙ্গে একদিন ও আসতে পারেনি। কখনও ফুলু মাসি, কখনও সুধন্য দা অথবা দিদিমা নিজেই থেকেছেন। আজ সবাই কিছু না কিছু করছে। সুধন্য দা বাড়ি নেই। মেজমামার সঙ্গে গোপের বাগ গেছে। দিদিমা

নাড়ু বানাচ্ছে ফুলু মাসিকে নিয়ে। এবং পদ্মই একমাত্র আছে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজমামী সদয় হয়ে গেছিলেন। একা ছাড়াবাড়িতে তুলসিমঞ্চের নিচে যাওয়া সন্ধ্যায় খুব সমিচীন না। পদ্মকে বলেছিল, যা মা পদ্ম, নীলের সঙ্গে যা। এবং পদ্ম কিছুটা পেছনে পেছনে এসেছে। দত্তদের বাড়ি পার হয়ে রাস্তা নিচে নেমে গেছে। মিলিদের অর্জুন গাছটা পর্যন্ত যেতে হয় না তাব আগেই পদ্মর ছাড়াবাড়ি। যাবার সময় দেখেছে, অর্জুন গাছের নিচে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও কখনও কখনও খুব ভুতুরে মনে হয়ে যেতে পারে। আসল না নকল কে জানে। ছোট দাদুর মৃতুর পর এই শশ্মানে যখনই এসেছে, কাক পক্ষি কুকুর বেড়াল দেখলে কেমন গুটিয়ে গেছে নীল। আসল কাক না নকল কাক। সঙ্গে কেউ থাকলেও মনে হয়েছে,দাদুরই আত্মা কাক বেড়াল সেজে এসেছে। সে কখনও মনে করতে পারে না, এরা সত্যিকারের কাক পক্ষি। এমন কি প্রথম প্রথম পদ্মকেও নকল পদ্ম ভেবে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদীপ দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটেছে।

আজ কিন্তু অন্যরকম। ভয় ডর কম। পদ্ম, মেজমামা বাড়ি আসার পর রোজই শাড়ি পবছে। এবং পদ্ম বোধ হয় আর ফ্রক পরবেনা। পদ্ম শাড়ি পড়লে খুব বড় হয়ে যায়। খুব একটা সাহস থাকে না বুকে। সে পদ্মর দিকে তাকিয়ে ভালভাবে তখন কথা বলতেও পারেনা। শাড়িটা কেমন দুজনের ভেতর একটা বড় হওয়ার কথা বলে দিচ্ছে। মেজমামা আসার পর পদ্মর এই শাড়ি পরাই' বোধ হয় যত অনিষ্টের কারন। সে, পদ্মর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলে বুঝি।

পদ্ম কতদিন পরে ডাকল, নীলদা।

নীল হাঁটতে হাঁটতে বলল, দেশালাই এনেছিসতো!

—এনেছি।

সামান্য জ্যোৎস্না উঠল। বড় তেতুল গাছটায় ডাল এখনও পোড়া পোড়া। চিতার আগুন অনেকটা ওপরে ওঠে ডালপালা পুড়িয়ে দিয়েছে।

এই পোড়াভাবটুকু চিতায় একজন মানুষের ছাই হয়ে যাওয়ার এখনও সাথি। নীল রোজ এসে একবার ওদিকটায় তাকাবেই। কতবার ভেবেছে তাকাবে না, কতবার ভেবেছে, চোখ বুজে চলে আসবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হয়, কেমন একটা খারাপ ধরনের ইচ্ছে, সে না তাকিয়ে পারে না। আজ এখানে এসে ওটার কথাও ভুলে গেল। ইঁটের চাতাল। ওপরে তুলসী মঞ্চ। সামান্য তেল ঢেলে দেওয়া হল। সলতে তেলে ভিজিয়ে ভারী রহস্যময়ী নারীর মতো পদ্ম দেশালাই জ্বেলে দিল। কিন্তু বাতাসে নিভে যাচ্ছে বার বার নীল পাজামা গুটিয়ে নিল। দেশালাইর ওপর দুহাতে আগল দিল। পদ্ম, মামীমার মতো আজ আলতা পরেছে দেখতে পেল। আলোতে রাঙ্গা পা, সুন্দর বড় বেশি প্রতিমার মতো পা, সে দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। হাতের ওপরই দেশলাইর কাঠি জ্বালছে।

পদ্মই যেন মনে করিয়ে দিল, হাতটা পুড়ছে।

নীল কাঠিটা ফেলে দিল।

তারপর পদ্ম বলল, আমাকে দাও।

নীল বলল, তুই পারবিনা। তিনবারের বার সে সলতেটা ধরাতে পারল।

পদ্ম ঝুঁকে সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিল। কিন্তু নীল বুঝতে পারছে না, পদ্ম মুখ এত নিচু করে রেখেছে কেন।

নীল বলল, পদ্ম ওঠ। যাব।

পদ্ম তবু মাথা তুলছে না।

নীল চিৎকার করে উঠল, পদ্ম আগুন ধরে যাবে! কি করছিস! তুই পুড়ে মরবি!

পদ্ম বলল, পুড়ে মরলে কি হয় নীল দা।

নীল আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। —তুই ছেলেমানুষী করিস না পদ্ম। ওঠ বলছি। এ-ভাবে ঝুকে আছিস কেন। পদ্ম শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।

পদ্ম বলল, বল আমার কথা রাখবে।

—রাখব পদ্ম, তবু তুই উঠে দাঁড়া।

—বল, তুমি আর কখনও মিলির সঙ্গে কথা বলবে না।

—না, বলব না।

—আগুন ছুয়ে বল।

নীল বলল, আগুন ছুয়ে বলছি।

—সবটা বল।

—আগুন ছুয়ে বলছি, মিলির সঙ্গে কথা বলব না।

—জীবনেও বলবে না।

—জীবনেও বলব না।

তবু পদ্ম কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। নীলদা যা একখানা মানুষ। এবং মিলিকে একটা ডাইনি ছাড়া সে কিছুই আব ভাবতে পারছে না। পদ্ম বলল, নীলদা যদি শুনি কিছু করেছ, আমি ঠিক আগুনে পুড়ে মরব একদিন দেখবে।

নীল বুঝে পায় না মেয়েটাকে। সেই কবে থেকে পদ্ম যেন সংসার থেকে মা বাবার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। যেন বলছে, আমিই' সব। পিসেমশাই, পিসিমা কেউ না। এবং ছোট দাদু মরে গিয়েও তেমন কিছু ক্ষতিকর হয়নি, কিন্তু পদ্ম চলে গেলে, এই গাছপালা, বাড়িঘর, বেচে থাকা সবই ভাবি অর্থহীন মনে হবে। ফাঁকা, মনে হবে পৃথিবীটা তার। পদ্ম, একজন পদ্ম তার জগত এত ধরে রেখেছিল, এই প্রথম টের পেল।

পদ্ম তখন উবু হয়ে কাঁদছে।

এবং এক সন্ধ্যায় নীল আর সুধন্য দা নৌকায় করে পদ্মকে দামোদরদির স্টিমারস্টেসনে রেখে আসতে গেল। নৌকায় লট-বহর চাকি বেলুন থেকে আরম্ভ করে থালাবাসন, যা কিছু ছিল সংসারে প্রায় সব উজার করে মেজমামী নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে পদ্মকেও নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সে স্টিমার ঘাটে বসেছিল। দূরে নদীর জল। মেজমামা মাঝে মাঝে ডেকে কথা বলছেন। মেজমামী তাকে বলেছে এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম মেজমামী বলছে, ভাল করে লেখাপড়া করিস। ভাল পাস করতে হবে। তোর বাপের নাম রাখিস।

শুনতে শুনতে নীলের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। পদ্ম বলল শুধু, বড় হলে কলকাতায় এস।

তারপর কি একটা ধনদের ভেতর পড়ে গেছিল নীল। কখন সাদা একটা স্টিমার এসে পদ্মকে সুদূরে তুলে নিয়ে গেল। যতদূর চোখ যায়, যতক্ষন আলো দেখা যায় দূরে, নীল স্টিমার ঘাটে বসেছিল চুপচাপ। একসময় সুধন্য বলেছিল, চলেন নীলু কর্তা। স্টীমার আর দেখা যাচ্ছে না। চলেন।

॥ সমাপ্ত ॥